ব্লুফ্লাওয়ার
অভীক দত্ত
boidownload.com

ব্লু ফ্লাওয়ার

দ্বিতীয় পর্ব

অভীক দত্ত

Blue Flower Part 2

By

Abhik Dutta

Cover by: Tousif Haque

বিনিময়- দুইশো কুড়ি টাকা

"যারা স্বর্গগত, তারা এখনও জানে

স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি..."

১।

মাথার পেছনে চাপ চাপ ব্যথা। প্রচন্ড শীত লাগছিল। ঘুম যখন ভাঙল দেখল কেউ একটা জোব্বা পরিয়েছে তাকে।

ডান হাতটায় প্রচন্ড ব্যথা। কোনমতে ঘাড় তুলে জানলার বাইরে দেখার চেষ্টা করল সে। বৃষ্টি হচ্ছে জোরে।

ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। আবার শুয়ে পড়ল।

চোখ বুজে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল। অনেকদিন পর মার মুখটা মনে পড়ছিল।

ঘরে কেউ একজন ঢুকেছে। খস খস শব্দ হচ্ছে।

সে এবার নড়া চড়া করল।

তাকে নড়তে দেখে যে ঘরে ঢুকেছিল সে তার দিকে এগিয়ে এল। তার কপালে হাত রাখল।

প্রবল শীতল হাত। সে শিউরে উঠল। চোখ খুলে দেখল এক মধ্যবয়স্কা। মায়ের মতই।

সে বলল "আমি কোথায়?"

মহিলা বললেন "তুমি অনেকদিন পরে জাগলে বেটা। এখন উঠো না। ওরা তোমার খোঁজে অনেকবার এসেছিল। তোমায় দেখলে মেরে ফেলবে"।

সে বলল "কারা মেরে ফেলবে?"

মহিলা বললেন "যারা আমাদের শত্রু। আমাদের সবার শত্রু যারা। তুমি শুয়ে থাকো। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি"।

পরম মমতায় মহিলাটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে একটা বাটিতে স্যুপ জাতীয় কিছু নিয়ে এসে তার ঠোঁটের কাছে ধরলেন। সে একটু একটু করে চুমুক দিল।

মহিলা বললেন "তোমার যখন জ্ঞান থাকত না, তোমাকে যে খাওয়াতে কত কষ্ট হয়েছে বেটা। এবার আশা করি তোমার অতটা কষ্ট হবে না ইনশা আল্লাহ"।

সে যতটা পারল খেল। তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক এসে তার বিছানার পাশে এসে বসে ভদ্রমহিলাকে বললেন "জ্ঞান ফিরেছে?"

মহিলা বললেন "জ্বী"।

ভদ্রলোক তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন "বেটা"।

সে চোখ খুলে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন "কী করে যে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি তা আমরাই জানি। ওরা গ্রামের পর গ্রাম তল্লাশি করে গেছে। নীলম নদী তছনছ করে দিয়েছে যদি তোমার লাশ পাওয়া যায়। কী করে বেঁচে আছো তুমি তা আমরাও জানি না। শুধু উপরওয়ালার অশেষ কৃপা, কোন অজানা পুণ্যের ফল পাচ্ছো হয়ত"।

সে বলল "আমি ভারতীয়। আপনারা জানেন?"

ভদ্রলোক হাসলেন "আন্দাজ করেছিলাম। নইলে ওরা তোমাকে এভাবে খুঁজবে কেন?"

সে বলল "তবে আমাকে বাঁচালেন কেন? ওদের হাতে তুলে দিলেই তো পারতেন!"

ভদ্রলোক বললেন "আমি ভারতীয়, পাকিস্তানি, কাশ্মীরি বুঝি না বাবা। আমি বুঝি পরম করুণাময় আল্লাহ তোমাকে আমাদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন। কতগুলো খুনিদের হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে যে গুনাহ করব এমন বেরহম আল্লাহর সত্যিকারের বান্দারা কোনদিন হতে পারে না।"

সে শুয়ে রইল। ভদ্রলোক বললেন "তুমি শুয়ে থাকো। এখন ওরা আর খুব বেশি এই গ্রামে আসছে না। তবে ঘর থেকে বেরিও না। আমি সবদিক খুঁটিয়ে দেখে তোমাকে এখান থেকে কীভাবে বের করার ব্যবস্থা করা যায় দেখব"।

সে বলল "আমার কাছে কোন টাকা নেই, কিছু নেই না। তাই না?"

ভদ্রলোক হাসলেন "মানুষ যখন এই পৃথিবীতে আসে তখনও কিছু না নিয়েই এই পৃথিবীতে আসে বেটা। তুমি চিন্তা কোর না, আগে তো বেঁচে থাকো, তুমি যখন বেঁচে গেছো তখন আবার নিশ্চয়ই তুমি ফিরতে পারবে নিজের বাড়িতে"।

সে জেগে থাকতে পারছিল না।

ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে এল।

ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি কিছু সবজি নিয়ে আসছি"।

ভদ্রমহিলা নীরবে মাথা নাড়লেন।

মড়ার মত বিছানায় শুয়ে রইল সায়ক।

সায়ক বড়াল।

২।

এরোপ্লেনে আগুন লেগে গেছে। আফসানা তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। মীর্জা তাক করে আছেন বন্দুকটা তার দিকে। সে পালাবে ভাবছে কিন্তু কোথাও যেতে

পারছে না। কোন প্রচন্ড ক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক তার পা মাটিতে আটকে রেখে দিয়েছে। বীরেন পেছন ফিরে দেখল জ্যোতির্ময় তার দিকে তাকিয়ে বলছেন "কেউ বাঁচাতে পারবে না তোমায়, তোমার বাড়ির লোক পর্যন্ত আমার হাত থেকে ছাড় পাবে না"। বীরেন ঘামছে, আর্তনাদ করছে কিন্তু গলা থেকে শব্দ বেরোচ্ছে না। কোত্থেকে প্রবল জোরে জলপ্রপাত এসে তার মুখে লাগল আর ঘুম ভেঙে গেল।

বীরেন ধড়মড় করে উঠে বসে বুঝল সে স্বপ্ন দেখছিল। সামনে অরিত্রি একটা বোতল থেকে জল নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছে। অরিত্রি একটা হলুদ সালোয়ার পরে আছে। খোঁপায় কোত্থেকে একটা হলদে ফুল জোগাড় করেছে। বীরেন বিরক্ত গলায় বলল "এই কী রে! কী শুরু করলি সকাল সকাল"!

অরিত্রি বলল "সকাল? ব্যাটা মাথাটা গেছে তোর? দশটা বাজে এখন!"

বীরেন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। বলল "ওরে বাবা! দাঁড়া আমি আসছি"।

অরিত্রি বলল "সে যেখানেই যা, বড় বাইরে যা, ছোট বাইরে যা, যা করবি তাড়াতাড়ি কর"।

বীরেন অবাক গলায় বলল "কেন? কী হয়েছে তোর?"

অরিত্রি বলল "বারাসাত নিয়ে যাবি"।

বীরেন বলল "কেন বারাসাত নিয়ে যাব কী করতে?"

অরিত্রি বলল "একটা এক্সামের ফর্ম তুলব। আরও একগাদা কাজ আছে"।

বীরেন বলল "পারলাম না। তোর রজতকে বল"।

অরিত্রি বলল "রজত তো চলে গেল কালকেই। আবার পুজোর পরে আসবে"।

বীরেন বলল "তো আমি কী করব? আমি খুব টায়ার্ড, এই কাল সবে দিল্লি থেকে ফিরলাম। আমার দ্বারা ওসব হবে না"।

বীরেনের বোন বুল্টি ঘরে ঢুকল। অরিত্রি বলল "দেখ রে বুল্টি, তোর দাদা এমন ঘ্যাম নিচ্ছে যেন কাল হাইজ্যাক হওয়া প্লেনে ওই সব টেরোরিস্টদের গুলি করে মেরেছে"। বলেই অরিত্রি খিল খিল করে হাসতে শুরু করল।

বুল্টিও হাসল। বলল "ঠিক বলেছিস অরিদি। দাদাটা আজকাল যা শুরু করেছে না, বাড়িতে খবর পর্যন্ত দেয় না। যেখানে যাবি যা না, তোকে কে বারণ করেছে, কিন্তু একটু ফোন তো করতে পারিস! মা নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত ডকে তুলে দিয়েছিল। দেখ না আবার হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। ফুটেজ মাস্টার কোথাকার!"

বীরেন কারও কথায় কান না দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। মুখ হাত ধুয়ে, বড় বাইরে সেরে ফিরে এসে দেখল তার ঘরে অরিত্রি আর বুল্টি তখনও গল্প করে যাচ্ছে। এখন গল্প চলছে রজত আর অরিত্রির বিয়ে নিয়ে। কোত্থেকে গয়না কিনবে, শাড়ি কিনবে, সব ডিটেলসে আলোচনা হচ্ছে।

বীরেন আবার খাটে এসে শুল।

অরিত্রি বলল "কীরে বীরেন, এরকম করছিস কেন, চ না। তুই বুঝতে পারছিস না, মা কিছুতেই আমাকে একা ছাড়বে না। আর আমার বারাসাত না গেলে আসল কাজটাই হবে না"।

বুল্টি বলল "যা না দাদা, এত করে বলছে যখন"।

বীরেন খাটে শুয়ে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে বলল "তুই যা না, কাজ বাজ তো কিছু নেই, শুধু লোকের মাথা খারাপ করবি। ফোট তো এখন"।

বুল্টি বীরেনের পায়ে একটা চিমটি কেটে বলল "একদম ভুলভাল বকবি না দাদা। আমি অনেক কাজ করি। দাঁড়া না, এস এস সিতে চাকরিটা পেতে দে, তারপর যখন আমার কাছে টাকা চাইতে আসবি, তখন দেখাব মজা"।

বীরেন হেসে বলল "এস এস সিতে চাকরি? ও তো তুই পাবি না তোর কঙ্কাল পাবে। শোন, ওসব চপবাজি রাখ। এখন ফুটে যা তো। ঘর খালি কর, দুটোই বেরো"।

অরিত্রি কাঁদো কাঁদো মুখে বলল "মাইরি বীরেন, তুই এরকম করবি?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ, করব। আমার পক্ষে তোর খিদমৎ খাটা সম্ভব না। আমার অনেক কাজ আছে"।

অরিত্রি মুখ ভ্যাংচাল "হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজ করে উলটে দিচ্ছেন একেবারে উনি। চ বলছি"।

বীরেন বিরক্ত মুখে উঠে বলল "তুই কি একটু শান্তি দিবি না? দেখছিস আমি কেমন টায়ার্ড হয়ে আছি, বা হাতে এখনও ব্যথা"।

অরিত্রি বলল "ও সব ব্যথা টেথা বনগাঁ লোকালে মানুষের ভিড়ের ঠেলা খেলে এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। চ তো"।

বীরেন বুঝল অরিত্রি ছাড়বে না কিছুতেই। সে বলল "ঠিক আছে। কিন্তু তোর বর যদি জানতে পারে তোর মেল বেস্ট ফ্রেন্ড আছে, তখন সন্দেহ করলে আমায় কিছু বলবি না কিন্তু"।

অরিত্রি চোখ বড় বড় করে বুল্টির দিকে তাকিয়ে বলল "দেখলি বুল্টি, তোর দাদা কী সব বলছে! খুব পেকেছিস তুই! যাবি একটু বারাসাত, ভাব দেখাচ্ছিস যেন তোকে ব্যাঙ্গালোর নিয়ে যাচ্ছি"।
বীরেন হাল ছেড়ে দিল। সে রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলল "মা, অরিত্রি জ্বালিয়ে খেল। বারাসাত যাচ্ছি"।
মা বললেন "যা, তবে ফিরিস তাড়াতাড়ি, হাতের দিকে খেয়াল রাখিস। আর কী, আমাদের কপালে কী আর মেয়েটা আছে! তুই চাকরি বাকরিও পেলি না, বলার মত মুখ থাকল কোই'! মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
বীরেন বলল "উফ, চুপ কর তো, শুনতে পাবে। যা হয়েছে, খেতে দাও। বেরোই"।
মা বললেন "দিচ্ছি। বস"।
বীরেন নিজের ঘরে গিয়ে অরিত্রিকে বলল "ওয়েট কর। খেয়ে নি। তুই খেয়ে এসেছিস?"
অরিত্রি বলল "হ্যাঁ। দেরী করিস না। তোর তো তিন ঘন্টা ধরে খাওয়া! অত সময় দিস না"!
বীরেন বলল "হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক হয়েছে"।
ফোনটা অফ করে শুয়েছিল সে।
ফোনটা নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে অন করল সে।
মা খাবার দিচ্ছিলেন।
বীরেন দেখল মোবাইলে মেসেজ এসেছে, তুষার রঙ্গনাথনের; "হাসান/জ্যোতির্ময়ের যে বাড়িতে তুমি প্রথম গেছিলে, সে বাড়িতে আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যে পৌঁছবে, দেখা হবে"।
বীরেন অবাক হয়ে মেসেজটা দেখল।
মা রেগে গেলেন "কীরে, খা! এই তো এতক্ষণ খেতে দাও বলছিলি,এখন আবার সেই মোবাইলে মুখ গুঁজে খুট খুট শুরু করে দিয়েছিস? উফ! এই মোবাইলটা কবর দিতে পারলে বাঁচি আমি!"

৩।

ডিফেন্স কাউন্সিলের গোপন মিটিং বসেছে ইসলামাবাদে মেজর জেনারেল নিয়াজির বাড়িতে। আছেন নিয়াজির ঘনিষ্ঠ মেজর রশিদ উল হক, উমর খান এবং ব্রিগেডিয়ার গুলাম মহম্মদ। সুদৃশ্য টেবিলে রাখা চারটে স্কচ ভর্তি গ্লাস।

রাখা আছে গোস্ত কাবাব সহ বিভিন্ন খাবার। কিন্তু কেউই খাবারে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। পরিবেশ যথেষ্ট গম্ভীর।

গুলাম মহম্মদই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন "আমার মনে হয় আমাদের এভাবে স্লিপার সেল নির্ভরতা কমাতে হবে। দ্য ডেথ অফ আফসানা সাইদ ইজ আ বিগ সেট ব্যাক ফর আস। গোটা দুনিয়া আমাদের নিয়ে হাসছে। কত আর এরকম আক্রমণাত্মকভাবে ব্যাপারটাকে ডিফেন্ড করব"?

উমর খান বললেন "স্লিপার সেল না থাকলে আমাদের ইন্টেলিজেন্স কীভাবে কাজ করবে? তবে হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমি একমত, আমাদের স্লিপার সেল নির্ভরতা কমানো উচিত"।

নিয়াজি বিরক্ত গলায় বললেন "প্রবলেমটা কী জানেন তো? আমাদের মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের অভাব। এরকম ইম্পরট্যান্ট একটা আলোচনা হচ্ছে অথচ সরফরাজই আসেন নি"।

রশিদ একটু গলা খাকরে বললেন "উনি আসবেন। আমাকে জানিয়েছেন। তবে দেরী হবে। ওঁর একটা স্পেশাল মিটিং আছে সন্ধ্যের"।

নিয়াজি গলার বিরক্তিভাবটা বজায় রেখেই বললেন "ঐ যে বললাম, সমস্যাটা ইন্টিগ্রেশনের। আমিই জানি না কী নিয়ে মিটিং, কার সঙ্গে মিটিং। দিস ইজ ডিজগাস্টিং। লিভ ইট, ওমর শেখের কোন আপডেট আছে"?

গুলাম মহম্মদ বললেন "সারেন্ডার করেছে"।

নিয়াজি বললেন "হোপলেস। ওই অবস্থাতেই চপার ভেঙে চারটে লোক মেরে মরতে পারত। কোন কাজে আসবে আমাদের এসব লোক?"

রশিদ বললেন "আপনি মনে হয় একটু বেশিই মাথা গরম করে ফেলছেন স্যার। ওমর শেখের বেঁচে থাকাটা আমাদের জন্য ফায়দার হতে পারে"।

নিয়াজি মুখ তেতো করে বসে থেকে বললেন "হাসান মাকসুদের কী খবর?"

রশিদ বললেন "কাস্টডিতে নিয়েছে রঙ্গনাথন। কিছু না কিছু নিশ্চয়ই বের করার চেষ্টা করবে। হি ইজ আ থ্রেট নাও"।

নিয়াজি বললেন "প্রায়োরিটিগুলো বোঝার চেষ্টা করুন রশিদ। হাসান আমাদের থ্রেট কেন হতে যাবে? লস্করের সঙ্গে ওদের কী সেট আপ ছিল, সেসব ওদের মাথা ব্যথা। সব ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করতে গেলে তো পাগল হয়ে যেতে হয়। এর মধ্যে আবার দেশে ইলেকশনের সময় হয়ে গেছে। আমাদের ভাবতে হবে পাকিস্তানের স্বার্থে দুর্বল মেরুদন্ডহীন কোন লোক যেন তখতে বসতে না পারে। সেক্ষেত্রে সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানের চিন্তা করতে হবে"।

উমর বললেন "জি স্যার। ইলেকশন নিয়ে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। পাশা সাহাবই জিতবেন ইনশা আল্লাহ"।

নিয়াজি বললেন "সেরকম ভাবেই ঘুঁটি সাজানো হয়েছে। দ্য গুড নিউজ ইজ, সি আই এও পাশা সাহাবের জিতই চাইছে"।

রশিদ হাসলেন "সে তো ওরা চাইবেই। পাশা সাহাব জিতলে পাকিস্তানে ডিফেন্স মেটিরিয়ালের ইমপোর্ট বাড়বে, ওরাও তো সেটাই চায়"।

নিয়াজি বললেন "আমেরিকাকে আমি বিশ্বাস করি না। ওরাও আমাদের করে না। জাস্ট এই বিজনেস ডিলগুলোর জন্য ওরা এখনও আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে"।

উমর বললেন "হাবিবুল্লাহ রসুল কিন্তু আমাকে আজও খবর পাঠিয়েছেন স্যার। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান"।

নিয়াজি বিরক্ত মুখে বললেন "কিছু একটা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে দি। তালিবানদের সঙ্গে আমার দেখা হলেই আমেরিকান জাসুসরা খবর পেয়ে যাবে"।

রশিদ বললেন "কিন্তু ওদের আমাদের দরকার। এটা ভুললে চলবে না"।

নিয়াজি বললেন "তাহলে আপনি দেখা করুন। বা অধঃস্তন কোন অফিসারকে বলুন ওর দাবী শুনে নিতে। আমার সঙ্গেই বা কেন বসতে হবে? পাকিস্তান আর্মির নামে এর মধ্যেই একগাদা অভিযোগ জমে আছে। তালিবানের সঙ্গে জুড়ে আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না"।

দরজায় টোকা পড়ল। নিয়াজির খানসামা এসে বললেন "স্যার সরফরাজ সাব এসেছেন"।

নিয়াজি ইশারায় বললেন সরফরাজকে নিয়ে আসতে।

রশিদ খুশি মুখে বললেন "এই তো স্যার, আপনি খুঁজছিলেন, উনি এসে গেছেন"।

সরফরাজ বেশ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে সোফায় এসে বসলেন। নিয়াজি বললেন "কী ব্যাপার? খুব ইম্পরট্যান্ট মিটিং ছিল নাকি?"

সরফরাজ একটা গ্লাস নিয়ে তাতে স্কচ ঢেলে এক চুমুকে সবটা খেয়ে বললেন "ইব্রাহিম আব্বাস এসেছিল"।

নিয়াজি বললেন "তো?"

সরফরাজ নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বললেন "ঝীলমের তীরে কাল একটা আনআইডেন্টিফায়েড বডি পাওয়া গেছে। সম্ভবত বড়ালের। মুখ চেনা যাচ্ছে না, পাথরে ধাক্কা খেয়েছিল মে বি, তবে ড্রেসটা বড়ালের ছিল"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড সরফরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন "শুধু এটা বলার জন্য ইব্রাহিম মুজফফরাবাদ থেকে এতদূর এসেছিল?"
সরফরাজ হেসে ফেললেন "আপনাকে ফাঁকি দিতে পারব না জানতাম"।
নিয়াজি এতক্ষণ পর নিজের গ্লাসটা হাতে নিলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "গিভ মি সাম গুড নিউজ সরফরাজ। কাল থেকে খুব বাজে যাচ্ছে সব কিছু"।
সরফরাজ বললেন "কাশেম সোলেমানি পেশোয়ারে আসছেন স্যার। পরশু"।
নিয়াজি স্থির চোখে সরফরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন "তো? আমরা কী করে দেখা করব? আমেরিকান ইঁদুরেরা খবর পেলে কী হবে বুঝতে পারছেন?"
সরফরাজ মাথা নাড়লেন "সেটা আমি বুঝব স্যার। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে কাশেম সোলেমানির দেখা হওয়াটা দরকার"।
নিয়াজি বললেন "আমি ইলেকশনের আগে এই রিস্কটা নিতে পারব না সরফরাজ"।
সরফরাজ ঘরে বসা বাকি তিনজনের দিকে তাকালেন। বাকিদের নির্বাক দেখে চুপচাপ নিজের গ্লাসটা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

৪।
খান নিজের চেম্বারে কাজ করছিলেন। মাথুর হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে বললেন "কী করছ?"
খান বললেন "কিছু বেসিক ইনফো এসেছে শ্রীনগর থেকে। এক জায়গায় করে রাখছিলাম"।
মাথুর বললেন "কী ইনফো?"
খান কাঁধ ঝাঁকালেন "অ্যাজ ইউজুয়াল। ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোড়ানোর প্ল্যান করছে কয়েকটা জায়গায়। রেড অ্যালার্ট জারি রাখতে বলা হয়েছে অবন্তী স্যারকে। ডাল লেকের একটা হাউজবোট থেকে তিনটে লস্করের ছোট সাইজের কুকুর ধরা পড়েছে। ওদের মেহমানদারি করার জন্য দিল্লি নিয়ে আসা হচ্ছে"।
মাথুর হাই তুললেন "এহ, এই?"
খান বললেন "কেন? কম মনে হচ্ছে? এক কাজ কর না, মুজফফরাবাদে চলে যাও। তোমার জন্য অনেক নিউজ অপেক্ষা করে আছে"।
মাথুর বললেন "আমি তো সিরিয়াসলি ভাবছিলাম এ ব্যাপারটা নিয়ে"।

খান বললেন "ভুলেও ভেবো না। তোমার যা ঘুম! দেখা গেল লস্করের ডেরায় গিয়ে ঘুমিয়েই পড়লে"।

মাথুর রেগে গেলেন "মোটেও আমার অত ঘুম না। তোমার কাজই হল সব বাড়িয়ে বলা"।

খান হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই গম্ভীর হয়ে বললেন "এই দেখো, সুখে থাকতে দেবে না এরা, অনন্তনাগে পোস্টার পড়ে গেছে, আফসানা সাইদের খুনের বদলা নেওয়া হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব"।

মাথুর বললেন "দিক। এই করে যাক। দিস ইজ অ্যান এন্ডলেস ওয়ার"।

খান বললেন "সিরিয়াসলি"।

খানের ফোন বাজছিল। খান দেখলেন তুষার ফোন করছেন। ধরলেন "ইয়েস স্যার"।

"খান, দু মি আ ফেভার"।

"বলুন স্যার"।

"কাল আমার কোলকাতা যাবার কথা ছিল। আমি যেতে পারছি না। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে হঠাৎ একটা আর্জেন্ট কল এসেছে। তুমি কাল কলকাতা যেতে পারবে?"

"শিওর স্যার। নো প্রবলেম। মাথুরকে নিয়ে যাব?"

"দেখো, মাথুরের কোন প্রবলেম না থাকলে নিয়ে যাও। হাসানের ঘরে ফার্স্ট সার্চটা তো মাথুরই করেছিল। ওর এক্সপেরিয়েন্সটা লাগবে আমাদের"।

"ওকে স্যার। জয় হিন্দ"।

"জয় হিন্দ"।

ফোনটা রাখলেন খান। মাথুর বললেন "কী হল? নিশ্চয়ই স্যার?"

খান বললেন "হ্যাঁ। কোলকাতা যেতে হবে। বললেন তোমার কোন প্রবলেম না থাকলে তোমাকেও নিয়ে যেতে"।

মাথুর বললেন "আমার কোন প্রবলেম আছে নে? আই লাভ মিষ্টি দই"।

খান হাসলেন। মাথুর বললেন "হাসানের খবরটা মিডিয়াতে না দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?"

খান বললেন "জানি না, স্যার মিনিস্ট্রি লেভেলে কথা বলেই খবরটা ছড়াতে দেন নি সম্ভবত। তাছাড়া হাসানের ফ্যামিলির লোকেদের কথাটাও ভেবেছেন। ওরা তো আমাদের হেল্পই করেছেন। আমরা যদি খবরটা লিক করে দিতাম, ওরা কলকাতাতে থাকতে পারতেন না"।

মাথুর বললেন "তবু সিকিউরিটিটা জোরদার থাকা দরকার। বলা যায় না, হাসান কী খাজানা কোথায় রেখে গেছে কে জানে"!

খান বললেন "একজ্যাক্টলি"।

মাথুর বললেন "আচ্ছা খান, একটা কথা বল তো। যদি জ্যোতির্ময়ের ফ্যামিলির লোক হিন্দু না হয়ে মুসলিম হত, তাহলেও কি ওরা সেম ট্রিটমেন্ট পেত? এভাবে ওদের সিকিউরিটি দেওয়া হত? আমরা ওদের এরকম চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারতাম?"

খান কয়েক সেকেন্ড মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন "না বোধ হয়"।

মাথুর হাসলেন "তাহলে কীসের সেকুলার কান্ট্রি ভাই?"

খান বললেন "দোষটা আমাদের কান্ট্রির নয়। দোষটা আসলে হিন্দুদেরও নয়। বেসিক্যালি কিছু পারসেন্টেজ লোক ধর্মটার এমন একটা রেপুটেশন করে রেখেছে যে স্বাভাবিকভাবেই এই অস্বস্তিকর ব্যাপারগুলো চলে আসে। তুমি আমি তো কিছু করতে পারব না। ইন্টারপ্রিটেশন আর মিসইন্টারপ্রিটেশনের মধ্যে একটা সুতোর তফাৎ মাথুর। যে লাইনটাকে কেউ শান্তি বলে চিহ্নিত করছে, সে লাইনটাই আরেকজনের কাছে জিহাদ হয়ে যাচ্ছে। আর সমস্যাটা বোধহয় এত উপর উপর দিয়ে দেখলে হয় না। সমস্যাটা অনেকটাই গভীরে। জিহাদ এটসেট্রা কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের টাইমেও এরকমভাবে ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মিডল ইস্টের অয়েল, আমেরিকার বিন লাদেন, আই এস আই এসের মত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরী করা, সব কিছু আসলে এক সুতোয় গাঁথা। এত সহজে একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেলে তো হয়েই যেত"।

মাথুর চিন্তিত মুখে বললেন "তা ঠিক। বাই দ্য ওয়ে, হাসানের পাড়ার একটা বাড়ি থেকে চারটে ছেলেকে ইন্টেলিজেন্স তুলেছে শুনেছ তো?"

খান বললেন "হ্যাঁ। ওদের মধ্যে একজন, নাম ইউসুফ, ওই ছেলেটাকে এয়ারপোর্টে দিয়ে গেছিল"।

মাথুর বললেন "স্মার্ট বয়, ইউসুফ ইজ আ জিনিয়াস, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, চোখের পলকে বানিয়ে দেয়"।

খান চিন্তিত মুখে বললেন "কলকাতায় গিয়ে এই ছেলেটার সঙ্গেও দেখা করতে হবে। বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও জানা বাকি আমার"।

৫।

রেহান অফিসে ছিলেন। কাশ্মীরে বর্ষাকালটা প্যাচপ্যাচে না হলেও বৃষ্টি পড়লে রাতের দিকে ভালই ঠান্ডা পড়ে।

বেশ কিছু কাজ জমে ছিল। ইনভেস্টিগেশনের ফাইল এসে পড়েছিল টেবিলে। মন দিয়ে সেগুলোই দেখছিলেন এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। রেহান ফোন ধরলেন। ওপাশে মা-র আর্ত কণ্ঠ ভেসে এল "একবার বাড়িতে আয় তো"।

রেহান বললেন "কী হয়েছে, বল না মা"।

মা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন "আয়, এসেই দেখে যা"।

রেহান বুঝলেন কোন সমস্যা হয়েছে। তিনি অফিস থেকে বেরোলেন। অফিসের বাইরে তার জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, নিরাপত্তারক্ষীও থাকেন একজন। রেহান গাড়িতে উঠলেই গাড়ি রওনা দিল।

ডাল লেকের কাছে অন্যান্য সময় পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। এবারে আর্মিতে ছয়লাপ। স্বাধীনতা দিবসে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তারই প্রস্তুতি। ডাল লেকের হাউজবোটগুলো মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ত্রস্ত সময়ে কেই বা আর ঘুরতে আসবে? বাজারের অধিকাংশ দোকান বন্ধ।

রেহান ড্রাইভারকে তাড়া দিলেন "একটু জলদি চল আনোয়ার"।

আনোয়ার বলল "হ্যাঁ স্যার, বুঝতেই পারছেন, স্পিড লিমিট আছে, বেশি জোরে গেলে কেস দিয়ে দেবে"।

রেহান ধমক দিলেন "সে আমি বুঝব। তুমি জলদি চল তো"।

আনোয়ার অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলেন। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে থাকা নিরাপত্তারক্ষী তারেক বলল "কোন প্রবলেম হয়েছে স্যার?"

রেহান বললেন "তাছাড়া আর কী? আমাদের কি আর শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ আছে? গিয়ে দেখি কী হয়েছে"!

রেহানের বাড়ি পুরনো শ্রীনগর অঞ্চলে, গলির ভেতরে। একটা জায়গা অবধি গাড়ি যায়, তারপরে হেঁটে যেতে হয়। গলির মুখে গাড়ি দাঁড়াতেই রেহান গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন।

তারেক রেহানের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে বললেন "স্যার, ধীরে, স্যার, আমি যাচ্ছি তো"।

রেহান তারেকের কথায় কান দিলেন না। দৌড়তে দৌড়তে নিজের বাড়ির সামনে এসে দেখতে পেলেন বাড়ির সামনে কেউ কালি দিয়ে "গদ্দার", "ভারত

কি বরবাদী, হামারি জিত", "পাকিস্তান জিন্দাবাদ", "কসা হাম জরুর লেঙ্গে" ইত্যাদি লিখে গেছে। বাড়ির সামনে পাড়ার লোকেদের ভিড়। রেহানকে পৌঁছতে দেখে মা দৌড়ে এলেন।

তার হাত ধরে বললেন "দেখ বেটা, কী করে গেছে ওরা"।

রেহান দেখল পাড়ার কয়েকজন তার দিকে আর্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রেহান মাকে জড়িয়ে ধরল "চিন্তা কোর না। কারা করেছে দেখেছ?"

মা বললেন "আমি তো রান্না করছিলাম। ইদ্রিশ আর সোবাহান বলল ছেলেগুলো নাকি পাশের মহল্লাতেই থাকে। মসজিদের পাশের গলিতে যে কার্পেটের ফ্যাক্টরিটা আছে, ওখানেই"।

রেহানে কয়েক সেকেন্ড লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে ইদ্রিশকে বলল "আলি ফ্যাক্টরি?"

ইদ্রিশ রেহানের প্রতিবেশী।

মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, ওখানে বেশ কয়েকটা ছেলে আছে দু দিন ধরে"।

রেহান মায়ের পিঠে হাত রেখে বললেন "ঠিক আছে, তুমি ঘরে যাও। আমি অফিস থেকে রাতে ফিরছি"।

মা বিমর্ষ মুখে রেহানকে বললেন "সাবধানে থাকিস বেটা"।

রেহান বললেন "হ্যাঁ তুমি যাও"।

মা ঘরের ভিতর ঢুকলেন। রেহান ইদ্রিশকে বললেন "চাচা, আপনারা কিছু বললেন না, ছেলেগুলো যখন লিখছিল?"

ইদ্রিশ আমতা আমতা করতে লাগলেন। বাকিরা সরে পড়তে লাগল।

রেহান হাঁটা লাগাল। পেছন পেছন তারেক বকতে লাগল, "কী অবস্থা স্যার, সব থেকে ভাল হয় আপনি ফ্যামিলি নিয়ে অন্য কোথাও শিফট করে যান, এরা থাকতে দেবে না এখানে"।

রেহানের চোয়াল শক্ত হচ্ছিল। গলির মুখে দাঁড়িয়ে কয়েকসেকেন্ড ভাবলেন। তারপর সটান হাঁটা দিলেন আলি ফ্যাক্টরির দরজায়"।

তারেক চেঁচাতে শুরু করল "আরে স্যার, কী শুরু করলেন। পরে ফোর্স নিয়ে আসব না হয়"।

রেহান তারেকের কোন কথাই কানে দিলেন না। আলি ফ্যাক্টরির গেট বন্ধ ছিল। রেহান জোরে জোরে দরজায় লাথি মারতে লাগলেন।

তারেক ক্রমাগত অনুনয় বিনয় করে যাচ্ছিল।

আলি ফ্যাক্টরির দুটো দরজা। একটা বড় দরজা আরেকটা ছোট।

লাথির শব্দে কেউ একজন ছোট দরজা খুলল।

রেহান গায়ের যত জোর আছে একত্রিত করে তার কলার ধরে রাস্তায় টেনে হিঁচড়ে বার করলেন "কোথায় শুয়োরগুলো কোথায়?"

যে ছেলেটাকে টেনে বের করা হয়েছিল সে একেবারেই কমবয়সী। ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল "ওই তো বারান্দাতেই বসে আছে"।

রেহান ছোট দরজাটা দিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকলেন। দেখল পাঁচ ছ জন বসে একটা বড় থালায় খাবার খাচ্ছে। রেহান বললেন "আমার বাড়িতে কালি লেপেছে কে?"

একজন তেড়ে এল "আমি লেপেছি। কী করবি তুই ইন্ডিয়ার কুত্তা?" উপস্থিত বাকিরা এই কথায় হো হো করে হেসে উঠল।

রেহান পকেট থেকে সার্ভিস রিভলভার বের করে পর পর দুবার গুলি করলেন লোকটার বুকে। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগে শেষবারের মত তার দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকালেন। বাকিরা পালাতে শুরু করল। তার মধ্যেই রেহানের রিভলভার গর্জে উঠল। তিনজনের পিঠে গুলি লাগল। বাকিরা পালিয়ে গেল। তারেক ভয়ে "স্যার, পাগল হয়ে গেলেন নাকি?" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে রেহানের হাত ধরে টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে বসে ড্রাইভারকে বলল "তাড়াতাড়ি অফিসে চল। জলদি"।

রেহান তখনও ফুঁসছিলেন।

এতক্ষণ বৃষ্টি পড়ছিল না। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল হঠাৎ করেই।

৬।

তুষার নিজের চেম্বারে কম্পিউটারে কাজ করছিলেন এমন সময় দেখলেন অবন্তী ফোন করছেন। ধরলেন তুষার, "গুড মর্নিং অবন্তী, কেমন আছ? সকাল সকাল ইডলি খেতে ইচ্ছা করল নাকি?"

অবন্তী বললেন "গুড মর্নিং বস। ঠিক সে কারণে তোমাকে ফোন করিনি। ফ্রি আছো এখন?"

তুষার বললেন "ফ্রি নেই তবে ফাঁকা আছি। চারদিকে কেউ নেই আপাতত"।

" একটা কাণ্ড হয়ে গেছে তুষার।"

"কী হল? মানে আবার কী হল? কাশ্মীরে কোন কাণ্ড না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের।"

"তা বটে, তবে এ ঘটনাটা অন্যের। তোমার রেহান একটা কার্পেট ফ্যাক্টরিতে ক্রি স্পেসে গুলি চালিয়েছে। দুজন স্পট, তিনজন হসপিটালাইজড হয়েছে। এলাকা পুরো আগুন হয়ে আছে"!

তুষার নড়ে চড়ে বসলেন " সে কী! কখন ঘটল?"

অবন্তী বললেন "জাস্ট কিছুক্ষণ আগে। রেহানের বাড়িতে ওরা কালি লেপে গেছিল"।

তুষার মাথায় হাত দিয়ে বললেন " মাই গড। রেহানের মত শান্ত ছেলে এটা কীভাবে করল? কোথায় আছে এখন?"

অবন্তী বললেন "আর কোথায় থাকবে, কাণ্ড ঘটিয়ে এসে আমার কাছে কনফেস করেছে!"

তুষার বললেন "ওকে। ফোনটা দাও ওকে"।

অবন্তী বললেন " জাস্ট হোল্ড"।

কয়েক সেকেন্ড পরেই রেহানের গলা ভেসে এল "ইয়েস স্যার"।

" এটা তুমি কী করলে রেহান?"

"মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল স্যার। নিজের বাড়িতেই এই নোংরামোটা দেখে জাস্ট নিতে পারি নি। বারবার মনে হচ্ছিল ওরা এত সাহস পায় কী করে?"

"হু। বুঝেছি। কিন্তু এটা তো এক্সপেক্টেডই ছিল। তোমার মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত ছিল। ছেলেগুলো কোথাকার? সবাই এলাকার?"

"যে দুজন স্পট হয়েছে এলাকার নয়। এখনও আইডেন্টিফাই করা যায় নি"!

" দ্যাটস আ গুড সাইন। তোমার মাকে আপাতত অন্য কোথাও নিয়ে যাও। তুমিও বাড়ি ফিরো না আজ।"

"কেন স্যার? নিজের বাড়ি নিজেই ফিরতে পারব না? এ কেমন কথা?"

"যা বলছি সেটা শোন। ইটস অ্যান অর্ডার"।

" ওকে স্যার"

"ফোনটা অবন্তীকে দাও"।

" ওকে স্যার"!

অবন্তী ফোন ধরলেন "হু, বল"!

" অবন্তী, এলাকার হাল কেমন?"

"যা হয়, রাস্তায় নেমেছে লোকজন। যে ক'টা লোক আমাদের ফরে ছিল, ঘটনাটার পরে প্রোটেস্ট করছে"!

" স্বাভাবিক। এক্সপেক্টেড। শোন অবন্তী, রেহান আমাদের খুব ইম্পরট্যান্ট একজন অফিসার"।

"জানি তো। এটাও বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ"।

" থ্যাংক ইউ!"

"হিউম্যান রাইটস এন্ড মিডিয়া..."

"কাশ্মীরে ইস্যুর অভাব নেই অবন্তী, দরকার হলে ইস্যু ক্রিয়েট কর। ওদের নজর ঘোরাও"।

" আই আন্ডারস্ট্যান্ড। তুমি চিন্তা কোর না, রেহানকে আমি সামলে নিচ্ছি"।

ফোনটা কাটলেন তুষার। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন।

ফোনটা আবার বাজছিল তার। রাখী আগরওয়াল। তুষার ধরলেন না প্রথমটা। আবার বাজতে শুরু করল ফোনটা। তুষার কয়েক সেকেন্ড বিরক্ত মুখে ফোনের দিকে তাকিয়ে ফোনটা ধরলেন "ইয়েস"!

" স্যার, কাশ্মীরে..."

"আমি একটা মিটিং এ আছি ম্যাম। পরে ফোন করি?"

" স্যার স্যার, জাস্ট কনফার্ম করার জন্য ফোন করছিলাম"!

"কী?"

"আপনারা দুজন লস্কর টেরোরিস্টকে গুলি করেছেন আজকে?"

"নো কমেন্টস। মিটিং এ আছি।"

"স্যার প্লিজ স্যার!"

ফোনটা কেটে হেসে ফেললেন তুষার। কোনো নিউজ মিডিয়া কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়!

উঠলেন তুষার।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে মিটিং শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। ফোন আবার বাজছিল। আবার মিডিয়া। তুষার ফোনটা কেটে দিলেন।

গাড়িতে উঠতেই গাড়ি স্টার্ট দিল। মোবাইলের নোটপ্যাডে আগে থেকে লিখে রাখা পয়েন্টগুলো ঝালিয়ে নিলেন।

কাশ্মীর যেমন দেশের মাথার ওপরে, সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনাও কোন কিছু নিয়ে ভাবতে হলে অনিবার্যভাবেই কাশ্মীর চলে আসবে।

আধঘন্টার মধ্যে মিনিস্টারের চেম্বারে প্রবেশ করলেন তিনি। তাকে দেখে মন্ত্রী গম্ভীর মুখে বললেন "খবরটা পেয়েছেন?"

তুষার আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বললেন "কোন ব্যাপারে স্যার?"
মন্ত্রী বললেন "কাশ্মীরে, উইদাউট এনি অর্ডার ফায়ারিং হয়েছে। হিউম্যান রাইটস, পাকিস্তানি মিডিয়া আমাদের ছিঁড়ে খাচ্ছে"।
তুষার বললেন "এক কাজ করি স্যার আমরা। কাশ্মীর থেকে আর্মি তুলে নি। কী বলেন?"
মন্ত্রী কয়েক সেকেন্ড তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি কি আমার সাথে ইয়ার্কি করছেন?"
তুষার হাসলেন "একেবারেই না স্যার। তবে মিডিয়া আর মানবাধিকার মাথায় রাখলে সবার আগে মনে হয় সেটাই করা উচিত"।
মন্ত্রী বললেন " হু। আর কোন রিসেন্ট থ্রেট ডিটেক্ট করতে পেরেছেন?"
তুষার বললেন "অনুপ্রবেশ বন্ধ করার ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিসিশন নেওয়া হোক। থ্রেট ব্যাপারটাই কমে যাবে"।
মন্ত্রী তুষারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন "ইউ আর ইম্পসিবল রঙ্গনাথন। চলুন, পি এম সাহেব ডাকছেন"!
তুষার উঠলেন।

৭।

মিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়েছিল। বাড়ির আবহাওয়া থমথমে হয়ে আছে। বাবা, কাকা কেউই অফিস যায় নি। কাকা কাকিমাকে নিয়ে একটু বেরিয়েছে। অন্যান্যদিন মিনি চুপ করে শুয়ে থাকলে মা এসে বকে বকে যেত, এ ক'দিন সব কিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে।
বাবা, কাকা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি জেঠুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন কী না। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বাড়ির ওপরে ছদ্মবেশে গোয়েন্দারা এবং নিরাপত্তারক্ষীরা নজর রাখছেন তবু বাড়ির সবার মধ্যেই একটা চাপা শঙ্কা কাজ করছে।
দরজায় কেউ একজন নক করল। মিনি গলা তুলে বলল "কে?"
মা বাইরে থেকে বলল "দরজা খোল"।
মিনি উঠে দরজা খুলল।
অনিন্দিতা বললেন "দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছিস কেন?"
মিনি বলল "এমনি। ভাল লাগছিল না"।

অনিন্দিতা ঘরে ঢুকে মিনির খাটের ওপর বসে বললেন "দেখ, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি"।
মিনি বলল "কী?"
অনিন্দিতা বললেন "এভাবে তো চলতে পারে না। সবাই সব সময় আতঙ্কের মধ্যে, লজ্জার মধ্যে এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তুই কলেজে যা আজ থেকে"।
মিনি বলল "বাবা-ই তো আমাকে কলেজে যেতে বারণ করেছিল"।
অনিন্দিতা বললেন "জানি তো। কিন্তু তুই বাড়িতে থাকলে, মানে এই পরিবেশে থাকলে ব্যাপারটা তোর জন্য মোটেও ভাল হচ্ছে না। আমি বুঝতে পারছি, আমরা নিজেরাও জানি না আমাদের এই মুহূর্তে ঠিক কী করণীয়, কিন্তু আমার মনে হয়, আপাতত তুই কলেজে যা। তারপরে যা হবে, দেখা যাবে"।
মিনি মাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকল কয়েক মিনিট। বলল "তোমার মনে আছে মা, আমি যখন ড্রয়িং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হতাম, জেঠু আমার জন্য কত কত গিফট নিয়ে আসত? আবার কত বইও পড়াত?"
অনিন্দিতা বললেন "মনে আছে"।
মিনি বলল "আর আমরা জানতেও পারলাম না, জেঠুর নাকি একটা ছেলেও আছে! ভাবতে পারছ বল তো?"
অনিন্দিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "কোন কিছুই কি আর ভাবতে পারার মত ঘটেছে, তুই বল? একটা লোক কীভাবে, এরকম বছরের পর বছর সব কিছু এত স্বাভাবিকভাবে জনসমাজে ঘুরে বেড়াল, আমাদের বাড়িতে থাকল, এর থেকে বড় রহস্য আর কী হতে পারে? একে তো অসম্ভব বললেও কম বলা হবে"।
মিনি বলল "আচ্ছা মা, জেঠু তার মানে দাউদ ইব্রাহিম বা লাদেনের মতই একটা লোক?"
অনিন্দিতা শিউরে উঠে বললেন "বলিস না, বলিস না, এসব কথা বলিস না। ভাবলেই আমার কেমন একটা লাগছে। আমাদের ভাগ্য ভাল এখনও সব কিছু মিডিয়াতে আসে নি। সব কিছু লোক জানাজানি হলে কী হতে পারে ভাবলেই আমার কেমন কেমন করছে"।
কলিং বেল বাজল।
অনিন্দিতা বললেন "দেখি কে এসেছে"।
মিনি বলল "তুমি বস, আমি দেখছি"।
মিনি উঠে দরজা খুলল। দেখল বীরেন দাঁড়িয়ে আছে। বলল "আপনি?"

বীরেন বলল "আমাকে তুষার স্যার আজকে এই বাড়িতে আসতে বলেছেন"।
মিনি দরজা ছেড়ে দাঁড়াল "ভেতরে আসুন"।
বীরেন খানিকটা ইতস্তত করে ঘরের ভিতরে ঢুকল। মিনি বীরেনকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বলল "মা সেই লোকটা এসেছে, যাকে জেঠু..."
অনিন্দিতা অবাক হয়ে বললেন "সেকী? কেন?"
মিনি বলল "ওঁকে নাকি তুষার স্যার আসতে বলেছেন"।
অনিন্দিতা বিরক্ত মুখে বললেন "সত্যি, কী যে শুরু হয়েছে, আমাদের বাড়িটা ঘিরে যে কত অচেনা অজানা লোক আসবে কে জানে। সেরকম বুঝলে তোকে নিয়ে কদিন আমার বাপের বাড়ি চলে যাব"।
মিনি হাসল "এই তো বললে সব কিছু স্বাভাবিক করতে, কলেজ যেতে, আবার বলছ বাপের বাড়ি চলে যাবে? তোমার কি মাথা ঠিক নেই?"
অনিন্দিতা বললেন "তাই হবে। মাথা কি আর কাজ করে? আচ্ছা, আমি গিয়ে দেখি ছেলেটা কী বলছে। তোর বাবাকেও ডাকি"।
অনিন্দিতা উঠে পাশের ঘরে গেলেন। সোমেন কাগজ পড়ছিলেন। অনিন্দিতাকে দেখে বললেন "কেউ এল নাকি?"
অনিন্দিতা বললেন "সেই ছেলেটা যাকে দাদা কী সব ক্যারিয়র না কী হিসেবে ইউজ করেছিলেন, সে এসেছে। তুষারবাবু নাকি এখানে আসতে বলেছেন একে"।
সোমেন অবাক হয়ে বললেন "সে আবার কী? চল তো দেখি"।
সোমেন উঠলেন। অনিন্দিতাও সোমেনের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তাদের দেখে বীরেন উঠে দাঁড়াল।
সোমেন বললেন "কী ব্যাপার ভাই? ঠিক কী কারণে এসেছেন জানতে পারি?"
বীরেন তুষারের চিঠিটা জেরক্স করে এনেছিল। সোমেনের দিকে এগিয়ে দিল।
সোমেন চিঠিটা পড়ে বললেন "ওহ। ঠিক আছে। আপনি কিছু খেয়ে এসেছেন?"
বীরেন কিছু বলার আগেই আবার কলিং বেল বেজে উঠল। অনিন্দিতা দরজা খুলে দেখলেন খান এবং মাথুর দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে খান বললেন "সরি ম্যাডাম, একটু ডিস্টার্ব করতে এলাম। বীরেন এসে গেছে?"
অনিন্দিতা বললেন "হ্যাঁ, আসুন"।
মাথুর এবং খানকে নিয়ে অনিন্দিতা ড্রয়িং রুমে এলেন। বীরেন দুজনকে দেখেই দাঁড়াল।

খান হাসিমুখে বললেন "এই তো, লাস্ট ব্রেভ বেঙ্গলি বয়। আচ্ছা আপনাদের বাড়ির উইমেনসটিকে তো দেখতে পারছি না! একটু ডাকবেন?"
অনিন্দিতা সোমেনের দিকে তাকালেন। সোমেন বললেন "কেন বলুন তো?"
খান বললেন "আহা ডাকুনই না"।
সোমেন মিনিকে ডাকলেন। মিনি জড়োসড়ো হয়ে ড্রয়িং রুমে এল। খান একটা বড় খাম মিনির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "পড়ুন ম্যাডাম, কী লেখা"।
মিনি দেখল একটা খাম। খানিকটা অবাক হয়ে সে মার দিকে তাকাল।
অনিন্দিতা বললেন "খোল না"।
মিনি খামটা খুলল। দেখল চিঠি লিখে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার সাহসিকতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
খান বললেন "তুষার স্যার নিজেই আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা জরুরি মিটিঙে আটকে গেলেন"।
মিনির চোখে জল চলে এসেছিল নিজের অজান্তেই।
খান বললেন "কাঁদবেন না ম্যাডাম, আপনি যেটা করেছেন নিজের দেশকে বাঁচাতে, যে উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আমরা সবাই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ"।
সোমেন বললেন "আর কৃতজ্ঞ! আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন কি? কীভাবে আমরা জীবন কাটাচ্ছি। সারাক্ষণ ভয় লাগছে এই বোধ হয় লোকে দেখিয়ে দেয়, এই দেখ টেররিস্টের বাড়ি"।
খান সোফায় বসে পড়লেন "একটু চা দিতে পারেন ম্যাম"।
অনিন্দিতা বললেন "নিশ্চয়ই"।
অনিন্দিতা বীরেনের দিকে তাকালেন "আপনি চা খাবেন?"
বীরেন মাথা নাড়ল "না, আমি চা খাই না"।
অনিন্দিতা রান্নাঘরে গেলেন। মাথুর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ইতস্তত করে সোমেনকে বললেন "জ্যোতির্ময়বাবুর ঘরটা আমরা আরেকবার সার্চ করে দেখতে চাই। আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো?"
সোমেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "কীসের আপত্তি আর। দেখুন। কী আর বলব"।
খান বীরেনের দিকে তাকালেন "বীরেন, মাথুরের সঙ্গে ঘর তল্লাশিতে যাও। তোমাকে অবশ্য তুষার স্যার এখানে আসতে বলেছিলেন কারণ এখানে উনি

এয়ারপোর্ট থেকেই সরাসরি আসতেন। তোমার কাজ অন্যত্র। আপাতত তোমাকে আজকেই আমার সঙ্গে শ্রীনগর যেতে হবে। আপত্তি নেই তো?"

বীরেন খানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল "নাহ। নেই"।

খান হাত বাড়ালেন "ওয়েলকাম টু আওয়ার গ্রুপ"।

বীরেন হাত বাড়িয়ে বলল "আমি কিন্তু কোন জামাকাপড় আনি নি"।

৮।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল সায়কের। বৃষ্টি থেমেছে।

অশক্ত শরীরে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। চারিদিকটা সবুজে সবুজ হয়ে আছে। কাশ্মীর কিছুক্ষণের জন্য হলেও সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে। সে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল।

"এখন কি একটু ভাল লাগছে বেটা?" ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন।

সায়ক বলল "হ্যাঁ। আচ্ছা আমাকে বলতে পারবেন এখান থেকে মুজফফরাবাদ কতদূর?"

ভদ্রলোক বললেন "অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা। কিন্তু তুমি এখন ভুলেও ওদিকে যেও না"।

সায়ক বলল "কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে একদিন। কতদিন থাকবে এখানে?"

ভদ্রলোক তার খাটে এসে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "আমাদের ছেলে নাফিস তোমারই বয়সী ছিল বেটা। মাঝে মাঝে কাজের নাম করে কোথায় যেন চলে যেত। যখন আসত হাতে অনেকগুলো টাকা। একদিন আর ফিরল না। পরে জানতে পারলাম, ওদের দলে ভিড়েছিল। ইন্ডিয়া বর্ডারে ঢুকতে গিয়ে গুলি খেয়ে..."

সায়ক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন "এখানকার বেশিরভাগ বাড়ির ছেলেদেরই কি ওরা এভাবে নিয়ে যায়?"

ভদ্রলোক বললেন "হ্যাঁ। এখানে ওরা ছেলেদেরকে নিয়ে গিয়ে টিভিতে দেখায় গুজরাটে, কাশ্মীরে কীভাবে মুসলিমদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। ওদের ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে উস্কানো হয়। কাম কাজ নেই, শুধু ছেলেগুলোকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর নামে গুনাহ করিয়ে যাচ্ছে বেটা"।

সায়ক ভদ্রলোকের বিচারবুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে বলল "আপনি আমায় অবাক করলেন। সবাই এতটা তলিয়ে ভাবে না। এমনকী ইন্ডিয়াতেও আপনার মত লোক কমে আসছে"।

ভদ্রলোক বললেন "ওদের রাজনীতিটাই যে টিকবে না কাশ্মীর না থাকলে। ইন্ডিয়া পাকিস্তান সর্বত্র এক দৃশ্য। রাস্তা নেই, কাজ নেই, শুধু জিহাদ। জিহাদে যে পেট ভরে না সেটা এদের কে বোঝাবে বল?"

সায়ক একটু উশখুশ করে বলল "আমাকে কিছু না কিছু করে ইন্ডিয়ায় একটা কনট্যাক্ট করতেই হবে। কিছুই কি করা যায় না এখন?"

ভদ্রলোক করুণ চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন "আর কিছুদিন কি অপেক্ষা করতে পারবে না? তুমি এই শরীর নিয়ে কী করবে বলত? মুজফফরাবাদে ওরা তোমাকে দেখলে আর বাঁচিয়ে রাখবে না এইবারে।"

সায়কের চোয়াল শক্ত হল "না। আমাকে যেতে হবেই। মুজফফরাবাদে না হোক, ইসলামাবাদে গেলেও হবে"।

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন "বেশ। আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমাদের গ্রাম থেকে একটা ভেড়ার ট্রাক ইসলামাবাদ যাবে আজ। তোমাকে খড়ের মধ্যে লুকিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তুমি কি এই শরীর নিয়ে এত ধকল সহ্য করতে পারবে?"

সায়ক বলল "আমাকে পারতেই হবে। যে করেই হোক, আমাকে যেতেই হবে"।

ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে বসে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা এলেন। ভদ্রলোক বললেন "ও আজ চলে যাবে"।

ভদ্রমহিলা শূন্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে তার কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন "তোমাকে একদম আমার ছেলের মত দেখতে জানো"।

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। ভদ্রলোক বললেন "এই দুনিয়া তৈরী হয়েছিল মানুষ থাকার জন্য। মানুষই আজ দুনিয়াটাকে জাহান্নাম করে ফেলল। তোমাকে দেখে কেন জানি না মনে হয় তুমি কারও ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার চোখের মধ্যে সেই সততাটা আমি দেখতে পাই যেটা। তুমি অন্য ধর্মের হতে পারো, অন্য দেশের হতে পারো, কিন্তু তুমি আল্লাহর খাস বান্দা। আমি বুঝতে পারি।"

সায়কের মনে হল ছোটবেলায় তার যখন জ্বর হত মা সারারাত জেগে বসে থাকত। তথাকথিত শত্রু দেশের এই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য দিন রাত এক করে খেটেছেন। লুকিয়ে রেখেছেন। কূটনীতি, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের রাজনীতি, একে কুপিয়ে মারা, তাকে পুড়িয়ে মারার

সময়ের মধ্যেও কেউ কেউ এখনও আছেন যারা সব কিছুর পরেও পৃথিবীতে মানুষ হিসেবেই বেঁচে আছেন। নোয়ার নৌকার কথা মনে পড়ে গেল তার। প্রলয়ের সময়ে যখন সবাই ভেসে যাবে, তখন হয়ত এরকম কিছু মানুষই বেঁচে থাকবেন নতুন পৃথিবী গড়বার জন্য।
কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নুয়ে এল।

৯।

"সিটবেল্ট বেঁধে নাও"; খান বললেন।
বীরেন খানের কথা শুনল। খান বললেন "তোমার ফোবিয়াটাইপ কিছু হয়েছে? এ দুদিনে হাইজ্যাকিঙের স্বপ্ন ক'বার দেখেছ?"
বীরেন হাসল "যতবার ঘুমিয়েছি, ততবারই মনে হয়"।
খান বললেন "আমার একটা ফোবিয়া ছিল। প্লেনে উঠলেই আমার মনে হত প্লেন ক্র্যাশ করবে"।
মাথুর জানলার ধারে বসেছিলেন। বললেন "অতীতরূপে কথা শুরু হয়ে গেল তোমার?"
খান হাসলেন "আমার ভয় কেটে গেছে সেটাই তো বলছি"।
মাথুর বললেন "তোমার ভয় কেটে গেছে বলে লোক জনকে তুমি ভয় খাইয়ে যাবে, এটাই বা কেমন ভদ্রতা হে?"
খান বললেন "তা বটে। তোমার আবার কবে থেকে এই ফোবিয়া হল?"
মাথুর বললেন "বরাবর। আমার এসবে চিরকালই অ্যালার্জি। একটা এত বড় জিনিস আকাশে উঠে পুরো উপরওয়ালার ভরসায় চলে, ভাবলেই কেমন যেন লাগে"।
খান বললেন "উপরওয়ালা কেন হবে? টেকনোলজি এখন অনেক উন্নত"।
মাথুর বললেন "বাকোয়াস। জিনিসটা যখন ভেঙে পড়ে কারও বাবার ক্ষমতা আছে কিছু করার? হ্যাঁ, বলতে পারো, প্রোবাবিলিটি কমেছে। কিন্তু সিস্টেম ফেইলিওর হবার পর সেটাকে প্রিভেন্ট করার সিস্টেম যদ্দিন না তৈরী হচ্ছে ততদিন আমার আর নাস্তিক হওয়া হল না ভাই"।
খান হাসতে লাগলেন। বীরেনের সবটাই স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। সে বলল "স্যার একটা প্রশ্ন ছিল"।
খান বললেন "করে ফেলো"।
বীরেন বলল "আমার কোন ট্রেনিং টাইপ কিছু হবে না"?

খান গলা নামিয়ে বললেন "দ্য কান্ট্রি ইজ ইন আ ওয়ার সিচুয়েশন বীরেন। পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হলে তোমার জন্য অন্য প্ল্যান ভেবে রেখেছি আমরা"।

বীরেন অবাক হয়ে বলল "বুঝলাম না স্যার। ওয়ার সিচুয়েশন মানে?"

খান বললেন "দেখবে একটু পরে যখন প্লেনটা আকাশ ছোঁবে তখন কখনও এয়ার পকেটে পড়লে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। এটা একটা সিগন্যাল যে দেখো ভাই, আমরা এখন সঙ্কটে আছি, সাবধানে বেল্ট ইত্যাদি পরে থাকো। খানিকক্ষণ পরে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমাদের ডিফেন্স সিস্টেমটা অনেকটা এরকম। ডিফেন্সে অনেকবারই আমাদের সিচুয়েশন আসে যখন আমাদের কাছে সিগন্যাল চলে আসে, আমরা সেই মতন ব্যবস্থাও নি কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা দেশের মানুষ জানতেও পারে না ঠিক কী সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে দেশ যাচ্ছে। তারা কে এফ সি যায়, ম্যাকডোনাল্ড যায়, আমেরিকা, জাপানের জিডিপি নিয়ে বড় বড় বাতেলা মারে, কারণ তারা জানেই না, কখনও কখনও এরকম সিচুয়েশনও এসেছিল, যে টেবিলে বসে তারা আমেরিকা জাপান করছিল, আমাদের ইন্টেলিজেন্স কাজ না করলে হয়ত ওই টেবিল শুদ্ধ সবটাই উড়ে যেত। তাদের অস্তিত্বটাই থাকত না। এই মুহূর্তে আমরা অনেকটা সেরকম সিচুয়েশনে আছি বলতে পারো"।

নাক ডাকার শব্দে বীরেন চমকে পাশে ফিরে দেখল মাথুর ঘুমিয়ে পড়েছেন। খান হেসে বললেন "মাথুরের মত হও বুঝলে? এটাই তোমার ট্রেনিঙের প্রথম টিপস। যে কোন সময়, যে কোন পরিস্থিতিতে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে"।

মাথুর নাক ডাকা থামিয়ে বললেন "আমি কিন্তু সব শুনতে পারছি"।

খান বললেন "আবার অ্যালার্টও থাকবে"।

মাথুর এবং খান দুজনেই হেসে ফেললেন। বীরেনও হাসল।

এয়ারবাস নড়ে উঠল।

খান বললেন "এই দেখো মাথুর, পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম এয়ার ক্র্যাশ কিন্তু টেক অফের সময়েই হয়েছিল"।

মাথুর বললেন "আমি তোমায় খুন করে ফেলব আশরফ। জাস্ট শাট ইউর ফাকিং মাউথ"।

খান বললেন "ঠিক টেক অফ হবার সময় ধর ইঞ্জিন অফ হয়ে গেল"।

মাথুর বললেন "তুমি থামবে?"

বীরেনের মজা লাগছিল। এত সিনিয়র দুজন অফিসার এরকম খুনসুটিতে মেতে আছেন ভাবতেই পারছিল না সে। প্লেন ঠিকঠাক টেক অফ করল। মাথুর বললেন "যাও, শান্তি"।

খান বললেন "তোমার আর কী। তুমি তো দিল্লি গিয়ে ঘুমোবে। আমাকে আবার শ্রীনগর যেতে হবে"।

মাথুর বললেন "যাবে। কাবাব খাবে ভালো তো"।

খান বললেন "ভালই বটে। ওদিকে আরেক কান্ড হয়ে বসে আছে ওখানে"।

মাথুর বললেন "কী?"

খান চারদিকে তাকিয়ে বললেন "রেহানের ব্যাপারটা"।

মাথুর মাথা নাড়লেন "ছেলেটা পেগলে গেছে"।

খান বললেন "পেগলে যায় নি রে ভাই... থাক, এ ব্যাপারে পরে কথা বলব"।

মাথুর বললেন "সেই ভাল"। বলেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার।

খান বললেন "যাও। এই ভাল আছে, সত্যি"।

১০।

রাত বারোটায় যখন সায়ক তাদের থেকে বিদায় নিল, ভদ্রমহিলা সায়কের হাতে একটা তাবিজ বেঁধে দিয়ে বললেন "পরম করুণাময় আল্লাহ তোমায় রক্ষা করবেন বেটা। কোনদিন যদি সম্ভব হয়, তুমি এসো আমাদের গরীব খানায়। জানি হয়ত কোনদিন আর দেখা হবে না তোমার সঙ্গে, কিন্তু যেখানেই থেকো ভালো থেকো"।

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। সায়ক নতজানু হয়ে প্রণাম করল দুজনকেই। দুজনেই অশ্রুসজল চোখে তাকে বিদায় দিলেন। ভদ্রলোক বললেন "ড্রাইভার ইস্তিয়াক আমার ছেলের বন্ধু ছিল। ও আল্লামা ইকবাল কলোনিতে ভেড়া নিয়ে যাবে। ওখানেই তোমাকে নামিয়ে দেবে। তারপরে তুমি কী করবে বেটা?"

সায়ক বলল "আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। খুদা হাফেজ"।

ভদ্রলোক তাকে জড়িয়ে ধরলেন "খুদা হাফেজ"।

ইস্তিয়াক বলল "ভাইজান আপনি আমার পাশে বসুন। আপনাকে খড়ের গাদায় যেতে হবে না। এই নিন, এই টুপিটা পরুন"। ইস্তিয়াক তাকে একটা ফেজ টুপি দিল।

ভদ্রলোক বললেন "তুই পারবি তো নিয়ে যেতে?"

ইস্তিয়াক হাসল "চাচাজান আপনি একটা কাজ দিয়েছেন আমি পারব না, তা কি হয়? আপনি একদম চিন্তা করবেন না"।

সায়ক ইস্তিয়াকের ট্রাকে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল। সুদৃশ্য ট্রাক। অনেকরকম কারুকার্য করা। পাকিস্তানের ট্রাকওয়ালারা তাদের ট্রাকে অনেকরকম জিনিস দিয়ে সাজিয়ে রাখেন। সায়ক বসতে ইস্তিয়াক গাড়ি স্টার্ট দিল।

ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে বিদায় জানাল সায়ক। জানলার লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখতে পেল ভদ্রমহিলা অঝোরে কাঁদছিলেন, ভদ্রলোক ওঁর স্ত্রীকে সামলাচ্ছিলেন।

ইস্তিয়াক বলল "মিয়াঁ আপনার বাড়ি কোথায়?"

সায়ক বলল "করাচী"।

ইস্তিয়াক বলল "আমি কোনদিন করাচী যাই নি। শুনেছি ভারি নোংরা শহর?"

সায়ক বলল "তা বটে। কাশ্মীরের থেকে সুন্দর জায়গা আর কী আছে বল?"

ইস্তিয়াক বলল "হ্যাঁ। আমি শুনেছি ইন্ডিয়ান কাশ্মীরের থেকেও নাকি পাকিস্তানি কাশ্মীর বেশি সুন্দর। আমরা তো ওদের থেকে আসল জায়গাটাই নিয়ে নিয়েছি মিয়াঁ কী বল? মুজফফরাবাদের লেকের মত জায়গা আর আছে নাকি ইন্ডিয়াতে?"

সায়ক জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, "তা বটে"।

ইস্তিয়াক বলল "তোমার কী হয়েছিল?"

সায়ক বলল "খুব শরীর খারাপ হয়েছিল চাচাজানের বাড়ি এসে। কোনমতে বেঁচে ফিরছি বলতে পারো"।

ইস্তিয়াক বলল "তা পুলিশ তোমায় খুঁজছে বলল যে চাচাজান? কী কেস করেছ হ্যাঁ? মেয়েছেলে?"

সায়ক ইঙ্গিতপূর্ণ হাসল।

ইস্তিয়াক বলল "মিয়াঁ তো খতরনাক আদমি আছো! তোমাকে কিনা পুলিশে খুঁজছে! করেছ কি মিয়াঁ?"

সায়ক বুঝল ইস্তিয়াক বকবক করতে ভালোবাসে। সে বলল "শরীর তো ভাল নেই মিয়াঁ, একটু চোখ বন্ধ করব?"

ইস্তিয়াক বলল "জেগে থাকো মিয়াঁ, পাহাড়ী রাস্তায় আল্লার ভরসায় গাড়ি চালাতে হয়, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমিও ঘুমিয়ে পড়ব। জানোই তো চোখ বন্ধ হয়ে গেলে সব গেল। আচ্ছা দাঁড়াও"।

ইস্তিয়াক গাড়ি দাঁড় করাল রাস্তার পাশে।

সায়ক অবাক হল "কী হল?"

ইস্তিয়াক বলল "দাঁড়াও তোমায় সাজিয়ে দি"।

ইস্তিয়াক সায়কের চোখে মোটা করে সুরমা দিল। সায়ককে পাঠানের মত পোশাক পরিয়েই দিয়েছিলেন ওঁরা। ইস্তিয়াক বলল "টুপিটা পরে নাও মিয়াঁ। আর চিন্তা নেই। তোমাকে একেবারে অন্যরকম লাগবে। সামনে একটা চেকপোস্ট আসছে। কোন কথা বলবে না। পাকিস্তানের পুলিশ তো, টাকা নেবে, আমি দিয়ে দেব। চিন্তা নেই কোন"।

সায়ক বলল "ঠিক আছে"।

ইস্তিয়াক গাড়ি স্টার্ট দিল আবার। খানিকক্ষণ পরেই চেক পোস্ট এল। ইস্তিয়াক জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নোট ছুড়ে দিতেই গেট খুলে দিল পুলিশ। সায়ক মনে মনে হাসল। জানলার খেলায় ভারত পাকিস্তান ভাই ভাই। বাকি রাস্তায় আরও দুটো চেক পোস্ট এভাবেই পার হল।

ইসলামাবাদে ঢোকার মুখের চেক পোস্টে অবশ্য পুলিশ গাড়িতে ঢুকে ভাল করে তল্লাশি করে তারপরেই শহরে ঢুকতে দিল। ইস্তিয়াক বলল "দেখলে মিয়াঁ, তোমাকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখলে হয়ে যেত অবস্থা খারাপ"।

সায়ক হাসল "শুক্রিয়া"।

ইস্তিয়াক বলল "শুক্রিয়ার কথা বোল না মিয়াঁ, খান চাচা আমাদের সব কিছু, উনি বলেছেন আমি শুনতে বাধ্য। তুমি এবার কোথায় যাবে? বাস স্ট্যান্ডে যাবে না স্টেশনে?"

সায়ক বলল "তুমি আল্লামা ইকবাল কলোনিতে যাবে?"

ইস্তিয়াক বলল "হ্যাঁ। ওখানের কসাইখানায় ভেড়া দিয়ে আমি ফিরে যাব"।

সায়ক বলল "তাহলে শহরের মেইন বাস স্টপে নামিয়ে দিয়ে চলে যাও"।

ইস্তিয়াক বলল "তাই হোক। এখন ভোর ভোর আছে, গাড়ি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে না। দুপুরের দিকে আসলে আর দেখতে হত না, বাসস্ট্যান্ডে যাওয়া বেরিয়ে যেত"।

সায়ক কিছু বলল না। খানিকক্ষণ পরে ইস্তিয়াক তাকে বাস স্ট্যান্ডে নামিয়ে চলে গেল।

সায়কের পথশ্রমে ক্লান্ত লাগছিল। ভোরবেলাতেও বাসস্ট্যান্ডে অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে। ফজরের আজান শুরু হয়ে গেছে।

সায়ক বাস স্ট্যান্ডে যাত্রীদের বসার জায়গায় ক্লান্ত শরীরে খানিকক্ষণ বসল। তারপরে উঠে একটা ফোন বুথে এসে একটা লোকাল মোবাইল নাম্বারে ফোন করল। প্রথমবারে কেউ ফোন ধরল না। সায়ক আবার ফোন করল। এবারে রিং

হতেই ঘুম জড়ানো গলায় কেউ বলল "কউন কমবখত মেরা নিন্দ হারাম কর রহা হায়?"
সায়ক একটু থেমে বলল "মেরা কুছ সামান তুমহারে পাস পড়া হ্যায়, ইজাজত"।
ওপাশে খানিক নীরবতা। তারপরেই গলার স্বরে পরিবর্তন এল "কাহাঁ হ্যায় আপ আল্লাহ কে বান্দা?"

১১।

তুষার ঘুমোচ্ছিলেন।
রাত দেড়টা অবধি ডিফেন্স কাউন্সিলের মিটিং ছিল। বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করতে করতে যে অত রাত হয়ে যাবে কেউ বোঝেন নি। বাড়ি ফিরে শুতে শুতে তিনটে বেজেছিল। সবে ঘুমটা জাঁকিয়ে এসেছে তুষারের ফোনটা বেজে উঠল।
তুষার বিরক্ত মুখে ফোনটা তুললেন "হ্যালো"।
"এক এয়সী লড়কী থি, জিসে মে প্যার করতা থা, দিলওয়ালে।"
ওপাশ থেকে পরিচিত গলাটা ভেসে এল।
তুষার উঠে বসলেন বিছানায়, "তুমি?"
"জিন্দা হ্যায় স্যার"।
তুষার উত্তেজিত গলায় বললেন "কোথায় তুমি এখন?"
"ইসলামাবাদে। এখন আর ডিটেলসে কিছু বলতে পারছি না স্যার। পরে কন্ট্যাক্ট করছি"।
ফোনটা কেটে গেল। তুষার প্রবল উত্তেজিত অবস্থায় কিছুক্ষণ খাটে বসে থেকে খাট থেকে নামলেন।
স্ত্রী ইরাবতী রান্না করছিলেন। তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন "কী ব্যাপার এখনই উঠে গেলে? এরপর তো দেখছি হাজারটা রোগ বাঁধিয়ে বসবে"।
তুষার হাসতে হাসতে বললেন "আরে যা খবর পেলাম সকাল সকাল তাতে যে ক'টা রোগ ছিল সেগুলোও সেরে যাবে ইরা। তুমি আমাকে ভাল করে এক মাগ কফি বানিয়ে দাও দেখি"।
ইরাবতী বললেন "তুমি বেরোবার প্ল্যান করছ নিশ্চয়ই সকাল সকাল?"
তুষার বললেন "সে তো নিশ্চয়ই। দেরী কোর না প্লিজ। ব্রেকফাস্ট এসে করব"।
ইরাবতী গরম জল বসালেন। তুষার তৈরী হয়ে নিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
ডাইনিং টেবিলে এসে বসে বললেন "রেডি?"

ইরাবতী বললেন "জাস্ট আরেকটু। কী ব্যাপার বল তো? এত খুশি তো তোমাকে অনেকদিন দেখিনি"।

তুষার বললেন "একজন খুব কাছের শিষ্য, ভেবেছিলাম মরে গেছে। জাস্ট খবর পেলাম হি ইজ অ্যালাইভ"।

ইরাবতী বললেন "সায়ক?"

তুষার হাসলেন "বুঝে গেলে?"

ইরাবতী বললেন "তোমার কাছের শিষ্য! আর কে হতে পারে? খান আর মাথুর তো বহাল তবিয়তেই আছে। তাই বাকি ক্যালকুলেশনটা করতে কতক্ষণ আর লাগে বল?"

তুষার বললেন "বাহ বাহ। মনে হচ্ছে তোমাকেও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে নিতে হবে"।

ইরাবতী কফি মাগ টেবিলে রেখে বললেন "মেয়েরা যে কোন অংশে কম নয়, আশা করি সকাল সকাল সে বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে না আমাকে"।

তুষার কফি মাগটা ইরাবতীর উদ্দেশ্যে তুলে ধরে বললেন "তোমরা আমাদের থেকে মাইলস অ্যাহেড। নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। বাই দ্য ওয়ে, তোমার আজ কলেজ আছে?"

ইরাবতী বললেন "হ্যাঁ। আজ আমাকে যেতেই হবে"।

তুষার বললেন "ম্যাডাম সাহিবা, আজ আমি ভাবছি আপনার সঙ্গে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করব। কেমন হয়?"

ইরাবতী হাসলেন "বুঝতেই পারছি আজ তুমি খুব খুশি। ওকে, তাই হোক। তবে গতবারের মত আমাকে বসিয়ে রেখে শেষে ফোন করে বোল না যেন আসতে পারবে না"।

তুষার বললেন "একেবারেই না, মিলিয়ে নিও। আজ আমি অবশ্যই আসব"।

ইরাবতী বললেন "দেখা যাক। বাই দ্য ওয়ে, সায়ক এখন কোথায়?"

তুষার বললেন "ইসলামাবাদে"।

ইরাবতী চোখ বড় বড় করে তুষারের দিকে তাকালেন। তুষার বললেন "ব্যাপারটা একটু রিস্কি, তবে ও যে বেঁচে আছে এটাই অনেক"।

ইরাবতী বললেন "তোমার বিশ্বাস ও এখনও বেঁচে থাকবে? আই মিন ইসলামাবাদে থেকেও?"

তুষার কফি মাগে চুমুক দিয়ে বললেন "ইয়েস ম্যাম। ও ইসলামাবাদে ছিল না, আমাদের কাছে খবর ছিল মুজাফফরাবাদেই ওকে মার্ডার করা হয়। কীভাবে বাঁচল... মিরাকল"!
তুষার কাঁধ ঝাঁকালেন।
ইরাবতী বললেন "তুমি শিওর তো সায়কই? ওর গলা নকল করে আর কেউ করতে পারে"।
তুষার মাথা নাড়লেন "কোড ম্যাচ করেছে ইরা। আর কেউ নয়"।
ইরা শ্বাস ছাড়লেন "গুড গড। নাও?"
তুষার বললেন "ইসলামাবাদে আমাদের দুটো ঘাঁটি আছে। জানি না ওর হেলথ কন্ডিশন ঠিক কী আছে এখন। আশা করছি আজকে দুপুরের মধ্যে ও আবার আমাকে ফোন করবে"।
ইরা বললেন "কেন? ওকে ফিরিয়ে আনবে তো এদেশে?"
তুষার ইরার দিকে তাকালেন "নো ওয়ে। স্টিল মাইলস টু গো বিফোর উই স্লিপ ইরা। আমি এলাম"।
তুষার উঠলেন।

১২।
সকাল ন'টা।
গাড়ি চলেছে শ্রীনগর ছেড়ে। বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিকক্ষণ আগে। এখন হচ্ছে না। তবে আকাশের মুখ ভার হয়ে আছে।
খান বললেন "আগেরবার তুমি অনন্তনাগে গিয়েছিলে না?"
বীরেন মাথা নাড়ল "হ্যাঁ"।
খান বললেন "এই মুহূর্তে গোটা কাশ্মীরটাই আগ্নেয়গিরি হয়ে আছে। অনন্তনাগে সেটার মাত্রা আরেকটু বেশি"।
বীরেন বলল "আমরা কি অনন্তনাগে যাচ্ছি?"
খান বললেন "নাহ। আমরা আপাতত সোনমার্গ ক্যাম্পে যাচ্ছি। একদিন থেকে পরের দিন কার্গিল রওনা দেব"।
বীরেন বলল "কার্গিল?"
খান হাসলেন "হ্যাঁ, সেই কার্গিল। তবে ভয়ের কিছু নেই আর, ওখানে এখন শান্তিই শান্তি"।
বীরেন বলল "আমি ঠিক কী কারণে যাচ্ছি জানতে পারি কি?"

খান বললেন "হ্যাঁ। তোমার ট্রেনিঙের প্রাথমিক ধাপ কার্গিল থেকেই শুরু হবে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আর্মির মত কাজ করে না। তোমাকে এই দুটোর ডিফারেন্স বুঝতে হবে। আমাদের কাজ অনেকটাই গোপনে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচয় লুকিয়ে করতে হয়"।

খানের ফোন বাজছিল। খান বললেন "এক মিনিট"।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রোদ, ঝড়, জলের মধ্যেই আর্মিরা অতন্দ্র পাহারায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন একটু পর পরই।

কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে এটা দেখে সাহস বাড়ার কথা না ভয় পাওয়া উচিত বুঝতে পারল না বীরেন। চারদিকে দেখলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেমন একটা ত্রস্ত ভাব।

খান ফোনটা রেখে বললেন "সেনাদের দেখছ?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

খান বললেন "খুব একটা ভাল চাকরি না, তাই না? এর মধ্যেই কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে বেশ কয়েকজন মারাও গেছেন। এই সৌন্দর্যের মধ্যে যে কত কাঁটা গোপনে লুকিয়ে আছে তা যারা এখানে না থেকেছে তারা বলতে পারবে না"।

বীরেন বলল "এই সব জায়গাই কি খুব টেনশনের জায়গা?"

খান বললেন "তাছাড়া আর কী? শুধু তো পাকিস্তানের সঙ্গেই না, আমাদের এখন গোটা রাজ্যের সঙ্গেই লড়াইটা লড়তে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, খুব কম সংখ্যক কাশ্মীরি এখন আমাদের হয়ে কথা বলছেন"।

বীরেন কিছু বলল না।

খান বললেন "চল চা খাওয়া যাক"।

খান ড্রাইভারকে একটা দোকানে দাঁড়াতে বললেন।

রাস্তার পাশেই বড় দোকান। খান গাড়ি থেকে নেমে বললেন "তোমাকে একটা খবর দি। সুখবর অবশ্যই। সায়ক বেঁচে আছে"।

বীরেন অবাক হয়ে খানের দিকে তাকাল, "কখন জানা গেল?"

খান বললেন "এই তো স্যার ফোন করে খবর দিলেন। গাড়িতে বললাম না ড্রাইভার ছিল বলে। এসব কথা নিজের ছায়াকেও বলা যাবে না"।

বীরেন বলল "তাহলে আমাকে বলছেন কেন?"

খান বললেন "তুমি আমাদের একজন তাই। চল চা খেয়ে আবার রওনা হতে হবে"।

খান হাঁটা লাগালেন।

বীরেনের একটু গর্ব হল। যে স্বপ্ন সে সারাজীবন দেখে এসেছে তা এভাবে সত্যি হলে কার না ভালো লাগে?

খান চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক চুমুক দিয়ে বললেন "তুমি একটা নতুন শহরে প্রথম গেলে প্রথমে কী কী দেখো?"

বীরেন বলল "আগে হোটেল দেখি। থাকতে হবে তো আগে"।

খান খুশি হলেন। বললেন "গুড। সায়ক এখন ঠিক কোথায় আছে জানো?"

বীরেন বলল "কোথায়?"

খান বললেন "ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে। ওখানে শহরের মধ্যেই আমাদের একটা ডেরা আছে। ছোট্ট একটা ঘরে। বাথরুম পর্যন্ত করতে গেলে অনেকটা হাঁটতে হয়। অথচ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে আছে ছেলেটা। চাকরি না করলেও হত এখন অবধি যা সেভিংস করে ফেলেছে। কী দরকার বল তো ওর চাকরি করে?"

বীরেন বলল "আপনি ইসলামাবাদ গেছেন?"

খান চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন "তিনবার। তিনবারই ওই ডেরায় আমাকে থাকতে হয়েছে"।

বীরেন অবাক হয়ে বলল "কবে গেছিলেন?"

খান বললেন "মাস ছয়েক আগেও। অদ্ভুত সুন্দর জায়গা ইসলামাবাদ। পৃথিবীর সুন্দরতম রাজধানীগুলোর মধ্যে একটা। বলড বাই পৃথিবীর কিছু কাপুরুষতম লোকজন। তুমি জানো বীরেন, আফগানজাতটার একটা ভাল গুণ আছে। ওরা যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তাদের জন্য জীবন দিয়ে দেয়। আর এই পাকিস্তানিগুলো ঠিক ওদের উলটোটা। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, মুখে বন্ধুত্ব দেখালেও পিছনে ছুরি নিয়ে তৈরী থাকে"।

বীরেন বলল "বাহ, অনেক বাঙালির মতই আর কী"!

খান হো হো করে হেসে উঠলেন।

১৩।

ঘুপচি ঘরটায় লম্ফঝম্প অন করল সায়ক। এখনও শরীরে যথেষ্ট শক্তি নেই। গা হাত পায় প্রচণ্ড ব্যথা। আব্বাস চা বানিয়ে ঘরে ঢুকল।

সায়ক বলল "আপডেট দাও, যা যা নিউজ আছে সব একসঙ্গে"।

আব্বাস বলল "চা তো খাও মিয়াঁ। আপডেট তো আছেই"।

সায়ক আব্বাসের হাত থেকে কাপটা নিয়ে চুমুক দিল। আব্বাসের হাতে জাদু আছে। অনেকদিন পর বাড়ির কথা মনে পড়িয়ে দিল।

কলল "ওহ, কতদিন পর"।
আব্বাস বলল "হু। তা বটে। তার আগে বল তোমাকে জবাই করার খবরটা রটল কী করে?"
সায়ক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল "আফসানা সাইদ যে আসলে ওদের স্পাই সেটা আমি মুজফফরাবাদে শেষ মুহূর্তে জানতে পেরেছিলাম। তার আগে ওদের একজন হয়ে যেতেও আমার বেশিদিন লাগে নি। হাসান মাকসুদ ওদের না জানালে ওরা জানতেও পারত না। দ্যাট ম্যান ইজ এ জিনিয়াস। আমারই ব্যাড লাক, খবরটা কোনভাবে জানিয়ে দিতে পারলে হাইজ্যাকিংটা আটকানো যেত"।
আব্বাস কলল "তারপর?"
সায়ক বলল "জামাকাপড় খুলিয়ে ব্রিজ থেকে নীলমের জলে ঠান্ডার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। লশকরের এক মেজো মাপের লিডার আছে বখতিয়ার বলে। সে মালটার মাথার মধ্যে এসব উদ্ভট আইডিয়া খেলে। প্ল্যান ছিল জলের মধ্যে ফেলে গুলি করে মারবে। বেশ কয়েকটা গুলিও চালিয়েছিল। কার কৃপায় জানি না, একটাও লাগে নি। যতটা সম্ভব ডুব সাঁতার দিয়ে অনেকটা যেতে পেরেছিলাম। তারপর জ্ঞান হারাই। আর কিছু মনে নেই"।
আব্বাস কলল "আর কার কৃপায় হবে? উপরওয়ালারই হবে"।
সায়ক বলল "তা বটে। বেঁচে গেছি সেটাই সত্যি। না বাঁচলেই বা কী হত?"
আব্বাস জোরে হেসে ফেলে কলল "ও হো হো, আশিক, সাচ্চা আশিক। সত্যি করে বল তো মিয়াঁ, কোন মেয়ে তোমার দিল ভেঙে দিয়েছে?"
সায়ক চায়ে চুমুক দিয়ে কলল "তাহলে কী করবে? সেই মেয়েকে নিয়ে আসবে?"
আব্বাস কলল "তা কেন? তবে এত বেপরোয়া জীবন তোমার, পাকিস্তান গভর্নমেন্ট তোমার জন্য এক কোটি টাকা ইনাম ঘোষণা করে রেখেছে, তা সত্ত্বেও তুমি তাদের বুকের ওপরে বসেই অপারেশন চালাবার কথা ভাবছ, এত হিম্মত তো সাধারন স্তরের ছেলেদের থাকে না। হয় একেবারে মাথা খারাপ, নইলে আশিক। দিলজালে টাইপ আশিক। ঠিক কিনা?"
সায়ক হাসল "ঠিক ঠিক। তা তুমিও মিয়াঁ কী টাইপের আশিক সেটা তো বল? নইলে হায়দ্রাবাদের বিরিয়ানি ছেড়ে ইসলামাবাদে পাকিস্তানি কাবাব খেতে চলে এসেছ কেন সেটাও তবে জানাও"।
আব্বাস হাসল "আশিক না। দিমাগ খারাপ আছে আমার"।

ঘরের বাইরে কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। আব্বাস সতর্ক হল। সায়ক ল্যাপটপটা লুকিয়ে ফেলল।

পরক্ষণেই স্বস্তি ফিরে এল।

রাঘব ভাটিয়া ওদের দেখে দরাজ গলায় বললেন "শুকিয়ে গেছিল নাকি সব?"

সায়ক করুণ মুখ করে বলল "তা বলতে পারেন ভাটিয়া সাব"।

রাঘব এসে সায়ককে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন "এখানে তোমার থাকা চলবে না বড়্যাল। ইসলামাবাদ ইজ নট সেফ ফর ইউ"।

সায়ক বলল "সে তো জানি কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কোথায় যাব আপনিই বলুন"।

রাঘব বললেন "ইন্ডিয়া ঘুরে এসো"।

সায়ক হাসল "খেপেছেন?"

রাঘবও বললেন "খেপি নি। তবে আমার মনে হয় পর পর তুমি লাকি নাও হতে পারো। ধরে নাও এবার ওদের গুলি মিস করল না"।

সায়ক বলল "কিংবা এও হতে পারে এটা আমার ভাল সময় চলছে। এই সময়ে কারও গুলি আমাকে টাচ করতে পারবে না। এই সময়েই সব কিছু করে যেতে হবে"।

রাঘব হো হো করে হেসে বললেন "তোমার সঙ্গে কথায় আমি পারব না সায়ক। আমি জানতাম"।

আব্বাস বলল "তাহলে খামোখা চেষ্টা করছেনই বা কেন?"

রাঘব বললেন "তুমি থামো তো ছোকরা। দুদিনের পাবলিক এসেছে আমাকে জ্ঞান দিতে। এদিকে মুঘলাই খাবার খেয়ে খেয়ে আমার পেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। কবে যে মায়ের হাতের খাবার খেতে পারব কে জানে"।

সায়ক বলল "তাহলে তো আপনারই এখন বাড়ি যাওয়া উচিত ভাটিয়া সাব। তা না করে আমাকে বলছেন কেন? কাবাবের দোকান দিয়ে পাঠান সেজে বসে আছেন, কতদিন আর এভাবে চলবে বলুন?"

রাঘব একটু হেসে সিরিয়াস হয়ে বললেন "একটা সিরিয়াস লিড আছে সায়ক। শুনবে?"

১৪।

"কেমন লাগছে জায়গাটা বীরেন?"

খান জিজ্ঞেস করলেন।

তাদের গাড়ি কাশ্মীরি গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। বীরেন কৌতূহলী হয়ে কাশ্মীরিদের দেখছিল। সর্বত্র একই চিত্র। একটা গ্রাম যেমন তেমনই আছে শুধু একটু পর পরই সশস্ত্র সেনা দাঁড়িয়ে আছে।

বীরেন বলল "খুব ভাল"।

খান বললেন "সাধে কি আর দুই দেশ মরছে কাশ্মীর নিয়ে"?

বীরেন বলল "এই প্রবলেমের কি কোন সলিউশন নেই?"

খান হাসলেন "ইচ্ছা হলে একদিনে সলিউশন বেরোয়। আর ইচ্ছা না থাকলে সারাজীবন মাথা খুঁড়ে মরলেও কিছুই বেরোয় না। সব থেকে সমস্যা সেসব কাশ্মীরিদের যারা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের জব করছে। যখনই কোথাও কোন সমস্যা হয়, আম কাশ্মীরিরা আর্মির থেকে লাথি ঝাঁটা খেয়ে আসে, সমস্ত রাগ পড়ে গিয়ে এদের ওপরে। রেহান যা করেছে তা আমি সবার সামনে স্বীকার না করলেও, ভেতরে ভেতরে আমিও জানি, একটা সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। নিজের কাছের লোকেদের মার খেতে দেখাও যায় না আবার নিজের ডিউটি ঠিক ঠাক পালন করলে যখন সবাই পিছনে লেগে যায়, সেটাও অসহ্য মনে হয়"।

গ্রাম পেরিয়ে তারা একটা খেতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। দু দিকে ঘন সবুজ ঘাস। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বীরেন বলল "আগের বারের আগে আমি কখনও কাশ্মীর আসি নি। আর এখন এমন অবস্থা পর পর দুবার এসে গেলাম"।

খান হাসলেন "আফসানা সাইদের কবরে ফুল দিয়ে এসো। ভদ্রমহিলা উপর থেকে তোমাকে দুয়া দেবেন"।

বীরেনও হেসে ফেলল।

খান বললেন "অ্যাকচুয়ালি সেভাবে দেখতে গেলে আমাদের দেশের এরকম দুয়েকটা আফসানা সাইদে কিছু যায় আসে না। আমরা তো আর ছোটখাট দেশ না। কত কত স্পাই লুকিয়ে আছে আমরা জানতেও পারি না। সুতরাং দেড়শো কোটির দেশে বুঝতেই পারছ ইন্টেলিজেন্সের গোটা নেটওয়ার্কটা সিনক্রোনাইজ করে চালানোটা কত কঠিন। তুষার স্যারকে হাসতে হাসতে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম স্যার এত কাশ্মীর কাশ্মীর করে ঝামেলা করে পাকিস্তান, আমরা তো কাশ্মীরটাকে আলাদা দেশ করে দিতেই পারি। তুষার স্যার একটা কথাই বলেছিলেন, কাশ্মীর হচ্ছে আমাদের দেশের মাথা। মাথা মানে সম্মান। সেটাই না থাকলে আর সে দেশের কী পড়ে থাকল? কথাটা আমি কোন দিন ভুলব না। অবশ্য আরেকটা ব্যাপারও আছে। বাস্তবটা হল কাশ্মীর আজাদ হলে সেটা

স্বাভাবিকভাবেই ইসলামিক স্টেট হবে। আর জঙ্গিদের অবাধ যাতায়াত শুরু হবে। রেজিস্ট করতে হলে..."
খানের কথা শেষ হয় নি গাড়িটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল।
খান ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন "কী হল?"
ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে ঠিক করতে শুরু করল।
খান এবং বীরেন দুজনেই গাড়ি থেকে নামলেন। খান ড্রাইভারকে এবার একটু ধমকেই জিজ্ঞেস করলেন "আরে কী হল বলবে তো?"
ড্রাইভার বলল "বুঝতে পারছি না স্যার। একটু টাইম দিন"।
খান অধৈর্য হলেন, "রোক। ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি সোনমার্গ পৌঁছে একটু বিশ্রাম করব"।

গাড়ি যেখানটা দাঁড়িয়েছে তার পাশে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। দরজা নেই। বীরেন বলল "দেখে আসব বাড়িটার ভিতরে? এরকম রাস্তার মধ্যে বাড়ি, তাতে আবার লোক নেই, ইন্টারেস্টিং লাগছে"।
খান বললেন "যাও। এখন তো সময়ই সময়। আমি একটু হালকা হয়ে নি"।
খান রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলেন।
বীরেন বাড়িটার ভিতরে গেল। চারদিকে ক্ষেতের মধ্যে এ বাড়িটা এরকম একলা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বেশ অবাক লাগছিল তার। হয়ত বাড়িতে যিনি থাকতেন তিনি শহরে চলে গেছেন। বাড়ির ভেতরে তেমন কিছুই নেই। বোঝাই যাচ্ছে যাওয়ার আগে বাড়ির মালিক বাড়ি খালি করে চলে গেছিলেন। একটা কাঠের বেঞ্চ রাখা ছিল। বীরেন সেটায় গিয়ে বসল। সব কিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটছে যে সত্যি ঘটছে না স্বপ্ন দেখছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বীরেন ঠিক করল সোনমার্গে গিয়েই বাড়িতে ফোন করবে। বাবা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না সে চাকরি পেয়ে গেছে। বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়েছিলেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দেখে। আসার সময় মা, বোনের কান্নার দৃশ্যটা নস্টালজিক করে দিচ্ছিল তাকে। কাশ্মীরের কোন এক অজানা রাস্তার পাশে একটা পরিত্যক্ত বাড়ির ভেতরটা হঠাৎ করে তাকে অনেক পুরনো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। বীরেনের ইচ্ছা হচ্ছিল সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে। সে মন খারাপ করে বসে ভাবছিল এখনই বাড়িতে ফোন করবে কি না এমন সময় বাইরে থেকে জোরে গুলির শব্দ ভেসে এল।
বীরেন দৌড়ে রাস্তায় নেমে দেখল একটা গাড়ি দ্রুত চলে যাচ্ছে, আর খান রাস্তায় পড়ে আছেন। চারদিক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। তাদের গাড়ির ড্রাইভার নেই।

১৫।

কুড়ি থেকে তিরিশ ফুট দূরে পড়ে আছেন আশরফ খান। বীরেন চারদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। পরিবেশটা যেমন ছিল তেমনই আছে। দূরে পাহাড়, অপূর্ব নৈসর্গিক পরিবেশ। শুধু সব কিছুর ছন্দ কেটে দিচ্ছে খানের রক্তাক্ত শরীরটা।

দৌড়ে খানের কাছে গেল বীরেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। বীরেন খানের নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গেল। শ্বাস চলছে। জ্ঞান নেই।

পেটটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুলিটা পেটে চলেছে।

সে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাল "কোই হ্যায়?"

কেউ কোথাও নেই। নিস্তব্ধ চারদিক। রাস্তায় আসার পথে প্রতিটা জায়গায় সেনা পোস্টিং দেখে এসেছে সে কিন্তু এখানে ধারে কাছে কেউ নেই।

বীরেন কোন মতে খানকে কাঁধে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে টানতে টানতে গাড়ির পেছনের সিটে নিয়ে এল। তার হাতে, জামাতেও অনেকটা রক্ত লেগে গেল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে তুষারকে ফোন করতে গিয়ে দেখল টাওয়ার নেই।

পেছনের দরজা বন্ধ করে বীরেন ড্রাইভারের সিটে বসল। গাড়িতে চাবি দেওয়াই আছে। মনে পড়ে গেল গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে একদিন শিখেই আর শেখা হয় নি তার। তবে স্টার্ট দেওয়া, আর গাড়ি চালাবার পদ্ধতি শিখেছিল সে। ঠাকুরকে ডেকে গাড়ির চাবি ঘোরাল বীরেন। ক্লাচ চেপে ফার্স্ট গিয়ারে দিল গাড়িকে। গাড়ি নড়ে উঠেই থেমে গেল। বুঝল স্টার্ট দিতে ভুল হচ্ছে। আবার চেষ্টা করল সে। একই ব্যাপার।

বীরেনের অধৈর্য লাগছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার খানকে দেখল সে। হঠাৎ করেই মনে হল কী হত যদি সে ওই বাড়িটায় না ঢুকত? এতক্ষণে তাকেও রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে হত। ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

চোখ বন্ধ করে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল সে। অনেক মনঃসংযোগ করে ঠিক সময়ে ক্লাচটা ছাড়ল সে। এবারে গাড়ি এগোল। বীরেন কোন দিকে না তাকিয়ে অ্যাক্সিলারেটরে পা দিল। গাড়ি গোঁ গোঁ করে এগোতে থাকল। সে গিয়ার চেঞ্জ করতে পারে না। ফার্স্ট গিয়ারেই যতটা সম্ভব গাড়িটাকে ছোটাতে শুরু করল। মিনিট দশেক বাদে রাস্তার ধারে এক জওয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বীরেন।

গাড়ি কোনমতে থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ল সে। রক্তাক্ত বীরেনকে দেখে জওয়ান রাইফেল বের করলেন। বীরেন দু হাত উপরে তুলে বলল "ডি আইবি, ডি আইবি"।

জওয়ান চেঁচালেন "কী হয়েছে?"

বীরেন হাত দিয়ে গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলল "অফিসার। গুলি খেয়েছেন"।

জওয়ান দৌড়ে গাড়ির কাছে এলেন। খানকে দেখে বললেন "কে উনি"?

বীরেন বলল "আশরফ খান। সিনিয়র অফিসার, ডি আই বি। আমরা সোনমার্গ ক্যাম্প যাচ্ছিলাম, সেখান থেকে কার্গিল। প্লিজ কিছু করুন"।

জওয়ান ওয়াকি টকি বের করলেন। খানের পালস পরীক্ষা করে বললেন "এখনও বেঁচে আছে। ওয়েট"। জলের বোতল বের করে খানের মাথায় মুখে জল ছিটালেন। খানের জ্ঞান ফিরল না।

ওয়াকি টকিতে জওয়ান কিছু একটা নির্দেশ দিলেন।

তার দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি কে? আপনি বেঁচে গেলেন কী করে? ওরা আপনাকে শুট করেনি?"

বীরেন বলল "আমি রাস্তার পাশের একটা বাড়ি দেখে ওখানে ঢুকেছিলাম"। বীরেন হাঁফাচ্ছিল। জওয়ান ওয়াকি টকিতে জোরে জোরে কাউকে ধমক দিতে শুরু করলেন। তাকে বললেন "আপনি ঠিক আছেন?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ। ওরা আমাকে দেখে নি। ড্রাইভার ছিল গাড়ির। সে নেই"।

জওয়ান মাথা নাড়লেন। বললেন "থাকবেও না"।

একটা আর্মি ইন্সপেকশন গাড়ি এল বেশ জোরে চালিয়ে। গাড়ি থেকে সাত আটজন জওয়ান নামলেন। জওয়ান খানকে দেখালেন। সবাই মিলে খানকে তাদের গাড়িতে তুলে নিলেন।

জওয়ান বললেন "আপনি ওদের সঙ্গে চলে যান। ওঁকে মেডিকেল ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে"।

বীরেন গাড়িতে উঠে বসল।

তার মাথা কাজ করছিল না কোনভাবেই।

#

তুষার অফিসে মিটিঙে ছিলেন। ফোন বাজায় নাম্বারটা দেখে চিনলেন না প্রথমে। ঠিক এই দুপুরের দিকটায় দৌরাত্ম্য শুরু হয় টেলি কলারদের।

দ্বিতীয়বার বাজায় ঠিক করলেন গালাগালি দেবেন। বিরক্ত গলায় ধরলেন "কে বলছেন?"

ওপাশ থেকে বীরেনের গলা ভেসে এল "স্যার, স্যার"।

তুষার বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। মিটিং রুম থেকে বেরিয়ে বললেন "কে? বলছেন? নামটা বলুন।"

"স্যার আমি বীরেন বলছি। খান স্যারকে গুলি মারা হয়েছে"।

১৬।

কলেজে এসে মিনির মনে হচ্ছিল অনেকদিন পর কোন জেলখানা থেকে বেরিয়েছে। বাড়িতে সব সময় একটা চাপা টেনশন মাথায় পাহাড়ের মত চেপে বসেছিল।

কলেজ তার তুলনায় খোলা মাঠে হাওয়া খাওয়ার সমতুল্য। এমনকি সব থেকে কড়া স্যার এস ডিজির ক্লাসও মনে হচ্ছিল কত ভাল। সবকটা ক্লাস করল সে। পাশের বন্ধুর সঙ্গে খাতায় কাটাকুটি খেলল, ক্যান্টিনে আড্ডা মারল, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল ভাল করে।

চারটে নাগাদ যখন কলেজ থেকে বেরোতে যাবে তখন দেখা হল মেহজাবিনের সঙ্গে। সে অবাক হয়ে বলল "কী রে, আজ কলেজে এসেছিলি তুই? ক্লাস করলি না যে?"

মেহজাবিন বলল "আমি কলেজ আসি নি রে আজ, নোটস নিতে এসেছিলাম। আমার এক দিদির বিয়ে, সেই নিয়েই ব্যস্ত আছি ক'দিন"।

মিনি বলল "বাহ, তাহলে তো তোরই বাজার রে এখন"।

মেহজাবিন বলল "হ্যাঁ, আমারই বাজার। যতসব! জানিস না তো কত কাজ করতে হচ্ছে এখন! বাদ দে, তোর খবর বল। শুনেছিলাম তুই কলেজে আসছিস না, আজ তো দেখে তোকে অবাকই হলাম"।

মিনি এক মুহূর্ত একটু থমকে বলল "হ্যাঁ, ওই একটু সমস্যা চলছিল আর কী!"

মেহজাবিন বলল "কী সমস্যা? শারীরিক?"

মিনি মাথা নাড়ল "না না, সেসব না"।

মেহজাবিনের মিনির মুখ দেখে একটু সন্দেহ হল। বলল "সত্যি করে বল তো, কী হয়েছিল? সেই লিফলেটটার পর থেকেই কিন্তু তুই কলেজে আসছিস না। কিছু হয় নি তো?"

মিনি হাসার চেষ্টা করল "আরে বাবা না না! তোকে বললাম তো কিছু হয় নি"।

মেহজাবিন ঠোঁট ওল্টাল "তাহলে ভাল। কী জানি বাপু, তোকে দেখেই আমার কেমন কেমন লাগছে"।

মিনি কলল "কী কেমন লাগছে"?

মেহজাবিন কলল "আছে আছে। ঠিক কলতে পারছি না। শোন, ফুচকা খাবি?"

মিনি ফুচকার নামে এক পায়ে খাড়া। দুই বন্ধুতে মিলে অনেক ফুচকা খেল। মিনির বেশ খুশি লাগছিল। মনে হচ্ছিল আজ কলেজে না এলে সে সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যেত।

ফুচকা খাওয়া হয়ে গেলে মেহজাবিন কলল "জানিস তো, আমার দাদা আবু ধাবি চলে যাচ্ছে"।

মিনি অবাক হল "কেন?"

মেহজাবিন বলল "একটা অয়েল কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। এদেশে চাকরির যা অবস্থা তা দেখে বাবাই এখন কলছে চলে যা। আমাদের সবার খুব মন খারাপ"।

মিনি কলল "ভালই তো হল, আবু ধাবি খুব দারুণ দেশ। তোর একটা ঘোরার জায়গা হল"।

মেহজাবিন কলল "আমার যেতে বয়েই গেছে। আমার এই দেশই ঠিক আছে। আরও ঠিকঠাকভাবে কলতে গেলে বলি, আমার আসলে কোলকাতা ছাড়া কোথাও যেতে ইচ্ছাই করে না"।

মিনি কলল "আমার তো উল্টোটা। আমার সব সময় মনে হয় যদি বেশ কয়েকটা দেশ ঘুরে আসতে পারতাম তাহলে কী ভালই না হত"।

মেহজাবিন মিনির থুতনি নেড়ে দিয়ে কলল "তা তো কলবিই। তাহলে একটা এন আর আই বর খোঁজ তবে!"

মিনি রেগে গেল "কেন? সব সময় বর বর করেন করব? নিজে চাকরি করব, নিজেই যাব"।

মেহজাবিন বলল "তাহলে তোকে সেই মিডল ইস্টেই জব খুঁজতে হবে। এখানে কে তোকে চাকরি দেবে?"

মিনি দুঃখী মুখ করে কলল "তা ঠিক। তবে মিডল ইস্টে গিয়ে মেয়েরা কি চাকরি করতে পারবে? আমার তো মনে হয় না"।

মেহজাবিন মাথা নাড়ল "তা করতে পারবি। সর্বক্ষণ হিজাব পরে থাকবি"।

মিনি বলল "কোন দরকার নেই বাপু। আমি এদেশেই ঠিক কিছু না কিছু একটা জুটিয়ে নেব তুই মিলিয়ে নিস"।

মেহজাবিন হাসল। বলল "তা তুই পারবি। তোর মধ্যে সে জিনিস আছে"।

দুজনে কথা বলতে কলতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল।

হঠাৎই তাদের চমকে দিয়ে একটা স্করপিও গাড়ি তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। চোখের নিমেষে গাড়ি থেকে
একজন নেমে এসে মিনির মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলল "গাড়িতে ওঠ"। মেহজাবিন বাধা দিতে গেল, লোকটা ওর মাথায় রিভলভারের বাট দিয়ে জোরে মারল। মেহজাবিন রাস্তাতে পড়ে গেল।
আশে পাশের লোক কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকগুলো মিনিকে ঠেলে গাড়িতে তুলল। দ্রুত বেগে গাড়িটা সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল।

১৭।
শ্রীনগর আর্মি হসপিটালের আই সি ইউর বাইরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন তুষার। আছেন অবন্তী, রেহান, মাথুর এবং বীরেন।
চপারে করে শ্রীনগরে নিয়ে আসা হয়েছে খানকে, অনেকটা রক্ত দিতে হয়েছে কিন্তু ডাক্তাররা কেউই এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারেন নি পেশেন্টকে বাঁচানো যাবে কি না। বাহাত্তর ঘন্টা না কাটলে কিছুই বলা যাচ্ছে না।
অবন্তী বললেন "তুষার প্লিজ বোস, এত চিন্তা করলে কী করে হবে?"
তুষার বললেন "আমার মাথা কাজ করছে না অবন্তী। ওরা কীভাবে প্রিপারেশন নিয়েছিল বুঝতে পারছ? ঠিক যে জোনটায় আর্মি মুভমেন্ট কম ছিল, সেখানটায় ওরা গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে খানকে মেরে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবতেই পারছি না"।
রেহান বললেন "ড্রাইভার এখনও বাড়ি ফেরে নি স্যার। ইনফ্যাক্ট ওর বাড়িটাও তালাবন্ধ এখন"।
তুষার বললেন "ও আর ফিরবেও না। নির্ঘাত ট্র্যাপড হয়েছিল, কিংবা..."
মাথুর বললেন "নিজে থেকেই ওদের দলে যোগ দিয়েছিল"।
তুষার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঞ্চে বসে বললেন "নাথিং ইজ ইম্পসিবল। থ্যাংক গড বীরেন ওখানে ছিল। ও না থাকলে কী হত ভাবতেই পারছি না"।
বীরেন জামা চেঞ্জ করেনি এখনও। জামায়, হাতে রক্ত লেগে আছে।
অবন্তী বললেন "বীরেন তুমি একটা কাজ কর, আমার ড্রাইভারকে আমি বলে দিচ্ছি, তুমি গেস্ট হাউসে গিয়ে চেঞ্জ করে নাও"।
বীরেন বলল "না স্যার, আমি ঠিক আছি"।
অবন্তী বীরেনের কাঁধে হাত রাখলেন "আমি বুঝতে পারছি বীরেন তুমি কতটা কনসার্নড এবং শকড। কিন্তু বিলিভ মি মাই বয়, দিস ইজ আওয়ার লাইফ।

তোমাকে সুইচ অফ করতেই হবে নিজেকে, কালকের জন্য নিজেকে তৈরী রাখতেই হবে"।

তুষার বললেন "ছেড়ে দাও অবন্তী। বীরেন থাকতে চাইলে থাক"।

মাথুর একটু ইতস্তত করে বললেন "খানের স্ত্রীকে জানাই নি এখনও স্যার"।

তুষার হাত নাড়লেন "জানাবার দরকার নেই। খানের কিচ্ছু হবে না। আমি জানি"।

তুষারের কথায় একটা অদ্ভুত জোর ছিল।

বীরেন চোখ বন্ধ করল। এই কয়েক ঘন্টায় তার যেন বয়স বেড়ে গেল অনেকটাই। আর্মি ক্যাম্পের ডাক্তার হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন। তুষার দিল্লি থেকে ফোন করে চপারের ব্যবস্থা করে খানকে শ্রীনগরে আনার ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তার যদিও বলেছেন বেঁচে যাবার সম্ভাবনা ৪০-৬০, কারণ রক্তপাতের পরিমাণটা প্রচুর হয়েছে, তবু তুষার এখানে আসার পর থেকে একটা কথাই বলে যাচ্ছেন, খানের কিচ্ছু হবে না। হি ইজ এ ফাইটার।

অবন্তী বললেন "এটা কারা করছে তুষার? হাসান তো জেলে, ওদের মাস্টারমাইন্ড আফসানাকে মেরে ফেলা হল। তবে?"

রেহান হাসলেন "স্যার বলেছিলাম না, ব্যাপারটা ব্ল্যাকহোলের মত। শুধু একটা জায়গায় ব্যবস্থা নিলেই হবে না? ওদের নেটওয়ার্ক কতটা ছড়িয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না"।

অবন্তী গম্ভীর মুখে বললেন "সব থেকে ভয়ের কারণ ওরা আমাদের খবর পেয়ে যাচ্ছে। কোন জায়গা থেকে নিউজ লিক হচ্ছে"।

তুষার চোয়াল শক্ত করলেন "যদি খানের কিছু হয়, আই উইল কিল দ্যাট বাস্টার্ড হাসান মাকসুদ"।

অবন্তী বললেন "ও তো একটা দাবার ঘুঁটি। ধরে নাও গজ কিংবা ঘোড়া। রাণী কে? রাজা কে? সেটা তো অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিবল বের করতে হবে তুষার"।

তুষার বললেন "আমাদের লাইফলাইন একটাই এখন অবন্তী"।

অবন্তী বললেন "সায়ক?"

তুষার ম্লান হাসলেন "আহত এবং ভীষণভাবে ক্লান্ত"।

অবন্তী বললেন "বাঘ তো! বাঘ আহত হলে আরও খতরনাক হয়"।

তুষার বললেন "মিনিস্ট্রি থেকে চাপ আসছে। আমাদের পাকিস্তানের অপারেশনগুলো আরও গোপনে করতে হবে"।

অবন্তী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে থেকে বেশ জোরে বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল।

সবাই চমকে উঠলেন।

তুষার বললেন "নাও, এবার হসপিটালেও ডিস্টার্বেন্স শুরু করে দিয়েছে ওরা"।

অবন্তী উঠে দাঁড়ালেন "তোমরা এখানেই থাকো, আমি দেখছি"।

অবন্তী দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

তুষার রেহানের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন "রেহান আমরা কি যুদ্ধটা হেরে যাচ্ছি?"

রেহান বললেন "নেভার স্যার। পরিস্থিতি যাই হোক। আমরাই জিতব"।

তুষারের ফোন বাজছিল। তুষার দেখলেন অবন্তী ফোন করছেন। ধরলেন "বল"।

"হসপিটালের বাইরে একটা গাড়ি ভর্তি বিস্ফোরক ছিল। ব্লাস্ট হয়েছে"।

"হু। এবারে ক'জন?"

"বুঝতে পারছি না। তোমরা ওখানেই থাকো। আমি আরও ফোর্সের ব্যবস্থা করছি"।

তুষার ফোন রেখে বললেন "এভাবে হয় না। হয় না"।

১৮।

পেশোয়ার পেরিয়ে আফগান সীমান্ত ধরে এগিয়ে চলেছে একটি ল্যান্ড রোভার গাড়ি। গাড়ির মধ্যে বসে আছেন আই এস আই চিফ সরফরাজ খান। সরফরাজ খানকে দেখে একটুও চিন্তিত মনে হচ্ছে না। আই পডে বলিউডি গান শুনছেন। সামনে পিছনে দুটি জিপ চলছে। জিপে ভর্তি পাকিস্তানি সেনা।

পেশোয়ারকে উপর উপর শান্ত শহর মনে হলেও আসলে পেশোয়ার মোটেও শান্ত জায়গা নয়। মাঝে মাঝেই এখানে গুলি গোলা চলে। বেশ কয়েকটি পাঠান গোষ্ঠী আছে যারা কাউকে তোয়াক্কা করে না। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন অঞ্চল থেকে খুন খারাপির খবর চলেই আসে।

পিচ ঢালা রাস্তা ছেড়ে গাড়িগুলো নেমে গেল বালি ভর্তি রুক্ষ রাস্তায়। ঘন্টা খানেক চলার পরে একটা বিরাট দুর্গের মত বাড়ির দরজায় এসে গাড়িগুলো দাঁড়াল। একজন সিকিউরিটি নেমে গিয়ে দরজায় গিয়ে হাঁক দিতে দরজা খুলে গেল। গাড়িগুলো বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়িটার গাড়ি বারান্দায় সরফরাজ খান দাঁড়াতে সামনের জিপ থেকে একজন নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল। সরফরাজ নেমে সটান বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন।

অপেক্ষা করছিল কয়েক জন খানসামা। সরফরাজ খান তাদের কাছে ইশারায় জানতে চাইলেন কোন ঘরে যেতে হবে। তারা দেখিয়ে দিল।

সরফরাজ খান তাদের দেখানো পথে দোতলায় উঠে একটা ছোট ঘরে ঢুকলেন। সুদৃশ্য সোফা। সামনে একটা বিরাট টিভি। সরফরাজ খান সোফায় বসে টিভি চালালেন। নিউজ দেখছিলেন, এমন সময় "আরে, সরফরাজ সাব, সালাম ওয়ালাইকুম", বলে ঘরে ঢুকলেন কাশেম সোলেমানি। আই এস আই এসের অন্যতম মাথা। আপাতত পাকিস্তান সরকারের গোপন ডেরায় রয়েছেন।

সরফরাজ খান উঠে দাঁড়িয়ে কাশেম সোলেমানিকে বললেন "ওয়ালাইকুম আসসালাম কাশেম সাব। এখানে কোন তকলিফ তো হচ্ছে না?"

কাশেম সোলেমানির বয়স পঁচিশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। অপূর্ব সুন্দর দেহ সৌষ্ঠব। গাল ভর্তি দাড়ি। গোঁফটা কামানো। সরফরাজ খানকে বললেন "না, তকলিফের কিছু নেই। কিন্তু আজ তো আপনার একা আসার কথা ছিল না"।

সরফরাজ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন "নিয়াজি স্যার এই ইলেকশনের মধ্যে আসতে পারবেন না। তার জন্য উনি গভীরভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছেন"।

কাশেম কয়েক সেকেন্ড তীক্ষ্ণ চোখে সরফরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমেরিকাকে আপনারা এত ভয় পান কেন সরফরাজ সাব?"

সরফরাজ বললেন "আমেরিকাকে আমরা কেন ভয় পাব?"

কাশেম মাথা নাড়লেন "পান পান। আপনি স্বীকার করবেন না, আমরা জানি আপনারা পান। আপনারা জানলেনও না অথচ আমেরিকা আপনাদের বুকের ওপরে বসে লাদেনকে মেরে চলে গেল"।

সরফরাজ একটু গলা খাকড়িয়ে বললেন "আপনি তো জানেন ওদের নেটওয়ার্ক কতটা স্ট্রং। এমনকি আমাকেও অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয়েছে"।

কাশেম বললেন "ঝুঁকি নেবেন। নিতে হবে। এতে আবার বলার কী আছে। দেখুন মিয়াঁ, একটা কথা আমাদের এখন বুঝে নিতে হবে, এই দুনিয়া এখন দুটো ভাগ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার দুটো ভাগ। একদিকে আছে মুসলিম দুনিয়া, অন্যদিকে কাফেরদের। পাকিস্তানকে আমরা সব রকম সমর্থন দিতে রাজি আছি,

কিন্তু তার জন্য পাকিস্তানকেও এক কদম এগিয়ে আসতে হবে। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি?"

সরফরাজ বললেন "আমরা আপনাদের সঙ্গে খোলাখুলি সন্ধিতে যেতে পারব না এটা শুরুতেই বলে রাখা ভাল। এই মুহূর্তে চিনের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক ভাল নয়, কিন্তু আমাদের ভাল। কূটনৈতিকভাবে চিনকে আমরা কিছুতেই দূরে ঠেলে দিতে পারি না। একদিকে আমরা তো ইন্ডিয়াকে প্রেশারাইজ করেই আছি, কিন্তু চিনও আমাদের হেল্প করছে। তাছাড়া পকিস্তান এখনও আমেরিকাকে রাগিয়ে দেওয়ার মত বিলাসিতা করতে পারে না বলেই আমি মনে করি"।

কাশেম কয়েক সেকেন্ড সরফরাজের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করলেন।

সরফরাজ অবাক গলায় বললেন "কিছু বলবেন?"

কাশেম বললেন "সরফরাজ সাব, আমরা কখনও এক জায়গায় বসে থাকবার জন্য জন্মাইনি। আমরা জন্মেছি এগিয়ে যাওয়ার জন্য। জেহাদ তখনই সফল হবে, যখন এই দুনিয়ার সব ক'টা দেশ শুধু আমাদের কথা শুনবে, আমাদের পায়ের তলায় থাকবে। আর আপনি পড়ে আছেন চিনকে নিয়ে"।

সরফরাজ বললেন "এসব কথা থাক। আসল কথায় আসি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, হিন্দুস্তানে কাশ্মীরের মানুষ কত অসহায় অবস্থায় আছে?"

কাশেম হাসলেন শব্দ করে। বললেন "যেমন একাত্তরের আগে ইস্ট পাকিস্তানে আপনারা বাঙালিদের রেখেছিলেন?"

সরফরাজ একটু থমকে বললেন "হু... মানে অনেকটা তাই বলতে পারেন"।

কাশেম বললেন "কাশ্মীরকে আজাদি দেওয়া আমাদের সবার পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। একজন সাচ্চা জিহাদী..."

দরজায় একজন অর্ধনগ্ন ইরানী মেয়ে এসে দাঁড়াল।

কাশেম উঠলেন "আপনি একটু বিশ্রাম করুন সরফরাজ সাব। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে আসছি"।

কাশেম তড়িঘড়ি মেয়েটিকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সরফরাজ খান মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

১৯।

মিনি অজ্ঞান হয়ে ছিল। জ্ঞান ফিরতে দেখল একটা সুদৃশ্য বেডরুমে, খাটের ওপর সে ঘুমিয়ে আছে।

মাথা ঝিম ঝিম করছিল। একই সঙ্গে মাইগ্রেনের ব্যথাটা ফিরে এসেছিল। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা।

সে কোন মতে উঠে খাট থেকে নামল। জানলার বাইরে গাড়ি চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। বেরিয়ে দেখল একটা বিরাট হলঘর। ওপেন কিচেন। একজন মহিলা রান্না করছেন। তাকে দেখেই বললেন "এস বেটি, বস"।

মিনি বলল "আমি কোথায়?"

মহিলাটি মিনির প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন "বস"।

মিনি একটা চেয়ার টেনে বসল। বলল "আমি বাড়ি যাব"।

মহিলাটি বললেন "যাবে তো। নিশ্চয়ই যাবে"।

মিনি বলল "এ জায়গাটা কোথায়?"

মহিলা বললেন "ভারতে না। তবে কাছেই। যশোরে"।

মিনি বলল "আমাকে কারা এখানে এনেছেন? কী কারণে? জানতে পারি?"

মহিলা বললেন "তুমি তো মাকসুদভাইয়ের ভাইঝি। তুমি আমাদের পর নাকি বেটি? তোমাকে সরাসরি আসতে বললে তো কোন দিন আসতে না। তাই আমার ছেলে নাজিব একটু জোর খাটিয়ে তোমাকে নিয়ে এসেছে"।

ভদ্রমহিলা অদ্ভুত শান্তভাবে কথা বলে যাচ্ছিলেন। যেন এসব হওয়ারই ছিল। একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মিনি বলল "আমি সবই বুঝতে পারছি, আপনারা জেঠুকে চেনেন। কিন্তু এভাবে কেন?"

ভদ্রমহিলা এবার গ্যাসের সামনে থেকে এসে তার কাছে এলেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন "মাকসুদ সাহেব তোমায় খুব ভালবাসেন মিনি। নাজিবকেও। তিনি চাইতেন তোমার সঙ্গে নাজিবের নিকাহ হোক"।

মিনি অবাক গলায় বলল "মানে?"

ভদ্রমহিলা বললেন "সব কিছুই তো উপরওয়ালারই ঠিক করে রাখা বেটা। আমরা কী করতে পারি বল?"

মিনি উঠল, "আমি বাড়ি যাব। দরজা কোথায়?"

ভদ্রমহিলা কিছু বললেন না। মিনি অস্থির ভাবে ঘরটার দরজা খুঁজতে আরম্ভ করল। যে ক'টা দরজা খুলল সবই কোন না কোন ঘরের দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সদর দরজা খুঁজে পেল। ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখল বেশ কয়েকজন পুরুষ চেয়ারে বসে আছে। প্রত্যেকের চেহারাই গুন্ডার মত। সে ভয় পেয়ে ঘরের আবার ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

ভদ্রমহিলা বললেন "ভয় পাচ্ছ কেন মেয়ে? এ তো আমাদেরই মহল্লা। হাসান সাহেবকে এখানে সবাই খুব ভালোবাসে"।

টেবিলের ওপরে জলের বোতল রাখা ছিল। মিনি জলের বোতল নিয়ে অনেকটা জল খেয়ে নিল। তারপর ভদ্রমহিলাকে বলল "আমাকে যেতে দিন প্লিজ। আমার বাবা, মা সবাই চিন্তা করছে। আপনিও তো একজন মা, বুঝতেই পারছেন, মেয়ে বাড়িতে না থাকলে মা বাবার মনের মধ্যে কী চলতে পারে"।

ভদ্রমহিলা তার মাথায় আবার হাত বুলিয়ে বললেন "বোকা মেয়ে। এও তো তোমারই বাড়ি। তুমি জানো না, সবই পরমকরুণাময় উপরওয়ালা ঠিক করে রাখেন। আমাদের কাছে হাসান ভাই ঈশ্বরের চেয়ে একটুও কম না। তিনি চেয়েছিলেন নাজিবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। এভাবেই তো আমরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠব। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। হাসানভাই তো তাই চাইতেন। তুমি জানো না, নাজিব ভীষণ ভাল ছেলে, খুব ভাল বাইক চালাতে পারে"।

মিনি রেগে গিয়ে বলল "এ আবার কী? আমি কেন আপনার ছেলেকে বিয়ে করতে যাব? চিনি না, জানি না, কাউকে একটা ধরে নিয়ে আসলেই হল?"

ভদ্রমহিলা বললেন "এই দেখো, বোকা মেয়ে। তোমাকে বললাম না বল, আমরা কি কেউ জানি, কার সঙ্গে উপরওয়ালা রিস্তা ঠিক করে রেখেছেন? দেখো না, তুমি কি আজ সকালেও জানতে পারতে, আজ রাতে তোমার বিয়ে হবে?"

মিনি চমকে তাকাল ভদ্রমহিলার দিকে। কয়েক মুহূর্ত বসে এবারে সে সটান দরজা খুলে রাস্তায় নামল। তাকে কেউ বাধা দিল না। অপরিচিত জায়গা। অনেকগুলো গলি। মিনি গলির ভেতর দিয়ে অনেকটা হাঁটল।

বেশ খানিকটা হাঁটার পরে সে বুঝতে পারল তার কেউ পিছু নিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন লম্বা চওড়া পুরুষ। গালের কাছটা কাটা। মিনি জোরে চেঁচাল "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও"।

কয়েক জন কৌতূহলী হয়ে তাকাল কিন্তু কেউ বিশেষ কান দিল না।

মিনি রাস্তার ওপর বসে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা এসে বললেন "চল বেটি, ঘরে চল, কাজি সাহেব কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন, আমাদের বেশিক্ষণ লাগে না। তিনবার কবুল বললেই হবে"।
মিনি নিশ্চল হয়ে বসে রইল।
#
গভীর রাতে এক অপরিচিত ছেলের সঙ্গে মিনির বিয়ে হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল মাথাব্যথায় যে কোন সময় মাথাটা বিস্ফোরণে ফেটে যাবে। একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়ে তার বিয়ে হল।

২০।
আইসিইউর সামনের বেঞ্চেই শুয়েছিল বীরেন। আরেকটা বেঞ্চে মাথুর শুয়েছিলেন। অবশ্রী তুষারকে জোর করে গেস্ট হাউজে পাঠিয়েছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ একজন নার্স এসে বীরেনকে ডাকলেন "স্যার, আশরফ খানের জ্ঞান ফিরেছে"।
বীরেন চমকে উঠে বসল। বেশ খানিকক্ষণ অবিশ্বাসীর মত নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল "এখন দেখা করা যাবে?"
নার্স বললেন "না স্যার। তুষার স্যার আমাকে বলেছিলেন খান সাহেবের জ্ঞান ফিরলে আপনাকে বলতে। তাহলে আপনি ওঁকে খবরটা দিয়ে দেবেন"।
বীরেন বলল "আচ্ছা। আচ্ছা"।
সে ফোন বের করে তুষারের নম্বর ডায়াল করল। একবার রিঙেই ধরলেন তুষার "বল বীরেন"।
"স্যার, খান স্যারের জ্ঞান ফিরেছে"।
"গুড। তুমি গেস্ট হাউজে চলে এসো। ওখানে এনাফ সিকিউরিটি আছে। মাথুরও থাকবে। চিন্তা কোর না"।
"স্যার এখানে কোন প্রবলেম হচ্ছে না। মাথুর স্যার তো ঘুমোচ্ছেন"।
"আমি বলছি তো। তুমি চলে এসো। চেঞ্জ করে রেস্ট নাও। চলে এসো।"
"ওকে স্যার"।
ফোন রেখে বীরেন ধীর পায়ে হসপিটাল থেকে বেরোল। বাইরেটা যুদ্ধক্ষেত্রের মত বাঙ্কার করে জওয়ানেরা দাঁড়িয়ে আছেন। বীরেনের জন্য গাড়ি রাখা ছিল। বীরেন ড্রাইভারকে জাগিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

সে ভেবেছিল এত রাতে তুষার ঘুমিয়ে পড়বেন। গেস্ট হাউজে পৌঁছে দেখল ট্র্যাকস্যুট পরিহিত তুষার চিন্তিত মুখে গেস্ট হাউজের লনে পায়চারি করছেন। খানিকক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। শীত শীত ভাব আছে একটা, যদি শীত এমন কিছু নেই। বীরেন বলল "স্যার আপনি ঘুমান নি?"

তুষার গম্ভীর গলায় বললেন "আর ঘুম। ওদিকে আরেক কান্ড ঘটেছে"।

বীরেন বলল "কোথায় স্যার?"

তুষার বললেন "হাসানের ভাইঝি কিডন্যাপড হয়েছে। কোন ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না"।

বীরেন হতভম্ব হয়ে তুষারের দিকে তাকাল।

তুষার বললেন "কালকেই আমাকে কোলকাতা যেতে হবে বীরেন। হাসানের সঙ্গে দেখা করতে হবে। খান সুস্থ হওয়া অবধি তুমি এখানেই থাকবে। রেহানের সঙ্গেও কন্টাক্ট রেখো। বিশ্বস্ত ছেলে। যে কোন অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করবে"।

বীরেন বলল "আচ্ছা স্যার"।

তুষার বললেন "যাও, তুমি একটা স্নান সেরে ঘুমিয়ে পড়। আমার আর রাতে ঘুম হবে না"।

বীরেন ধীর পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগোল।

#

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর এক গোপন অন্ধকূপে শুয়ে ছিলেন জ্যোতির্ময়। একজন অফিসার এসে দরজা খুলতে জ্যোতির্ময়ের মুখে আলো পড়ল।

জ্যোতির্ময় বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে তারপর চোখ খুলে দেখলেন সোমেন এবং অনিন্দিতা এসেছেন। বাঁকা সুরে বললেন "এতদিন পরে তোদের আসার সময় হল?"

সোমেন উদ্বিগ্ন গলায় বললেন "দাদা, সব কৈফিয়ত দেব, কিন্তু শোন, গতকাল থেকে মিনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকজন ছেলে ওকে কাল রিভলভার ঠেকিয়ে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে..." সোমেনের গলা ধরে এল। অনিন্দিতা কাঁদছিলেন।

জ্যোতির্ময় ঠান্ডা গলায় বললেন "এতো ভবিতব্যই ছিল। এতে এত চিন্তা করার তো কিছু নেই"।

সোমেন উত্তেজিত মুখে বলল "তুই কিছু কর দাদা, প্লিজ, মিনি তো আমাদেরই বাড়ির মেয়ে বল। ও তো কোন দোষ করে নি বল?"

জ্যোতির্ময় হেসে দিলেন। বললেন "মিনি কিছু না করলে আমি কি এখানে থাকতাম সোমেন?"

সোমেন কিছু বলতে পারলেন না।

অনিন্দিতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন "প্লিজ দাদা। মেয়েটার জন্য কিছু করুন, প্লিজ"।

জ্যোতির্ময় বললেন "তোমাদের এখানে কোন খোচর পাঠিয়েছে?"

সোমেন বললেন "আমরা নিজেরাই আবেদন করে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম দাদা"।

জ্যোতির্ময় ব্যঙ্গ করে বললেন "উফ!!! কত ভালোবাসা!"

অনিন্দিতা বললেন "কিছুই কি করা যায় না দাদা?"

জ্যোতির্ময় বললেন "ফোন এনেছ তোমরা?"

সোমেন বললেন "না। এখানে আসার আগে মোবাইল নিয়ে নিয়েছিল সিকিউরিটি"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ফোনটা চা। একটা নাম্বার বলছি। ফোন কর"।

সোমেন বললেন "আচ্ছা"।

সেলের বাইরে গেলেন সোমেন। বাইরে দাঁড়ানো নিরাপত্তারক্ষীকে বললেন "আমার ফোনটা দরকার"।

নিরাপত্তারক্ষী বললেন "উনি ফোন করতে চাইছেন?"

সোমেন বললেন "হ্যাঁ"।

নিরাপত্তারক্ষী তুষারকে ফোন করলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পরে সোমেনকে তার ফোনটা দিলেন।

সোমেন সেলের ভিতরে ঢুকে দেখলেন অনিন্দিতা কাকুতি মিনতি করছেন মেয়ের জন্য। জ্যোতির্ময় অন্য দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

সোমেন বললেন "বল, নাম্বারটা"।

জ্যোতির্ময় বললেন। সোমেন তাড়াতাড়ি ডায়াল করলেন সেই নাম্বারটা। আই এস ডি কল হচ্ছে দেখলেন।

একবার রিং হতেই কেউ একজন ধরল।

সোমেন বললেন "কথা বলুন"।

সোমেন ফোনটা জ্যোতির্ময়কে দিলেন। জ্যোতির্ময় কিছুক্ষণ কথা বলে সোমেনকে বললেন "মিনিকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। ভালোই থাকবে"।

সোমেন অবাক হয়ে বললেন "মানে? তুই জানিস এখন কোথায় মিনি?"

জ্যোতির্ময় বললেন "জানি। আমি কী মনে করি জানিস তো, এই জগতেই মানুষের কৃতকর্মের ফল মানুষ ভুগে যায়"।
সোমেন অধৈর্য হয়ে বললেন "প্লিজ দাদা । বাড়ির মেয়েটাকে..."
জ্যোতির্ময় একটুও উত্তেজিত না হয়ে বললেন "মধ্যযুগে কীভাবে কনভারসান হত জানিস? এখন আমাদের হাতে সময় বড় অল্প। যা করার এভাবেই করতে হবে। নইলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। মনে রাখিস, যা হয় ভালোর জন্যই হয়, যা হবে ভালোর জন্যই হবে। আর হ্যাঁ, বাড়ি ফেরার আগে মিষ্টি কিনে বাড়ি যাস। তোর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে"।
সোমেন দাঁড়ানো ছিলেন। জ্যোতির্ময়ের শেষ কথাটা শুনে মেঝেতেই বসে পড়লেন।

২১।
ভোর পাঁচটা। এখনও সূর্যোদয় হয় নি।
একটা ছোট গাড়িতে বেরিয়েছে রাঘব, আব্বাস এবং সায়ক।
গন্তব্য ইসলামাবাদ আম্বেদকর অ্যাভিনিউ।
রাঘব গাড়ি চালাচ্ছেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "সায়ক, তোমার এই সুইসাইডাল মিশনের মধ্যে কেন যে নিজেকে জড়াতে গেলাম, তাই ভাবছি"।
আব্বাস ক্ষীণস্বরে বলল "যা বলেছেন। সায়কের মাথা খারাপ হয়ে গেছে"।
সায়ক বলল "রিভলভারগুলো একটাও টেস্ট করে দেখা হল না। চলে তো সব?"
রাঘব রাগী গলায় বললেন "জানি না"।
সায়ক হাসল "না, মানে যদি কাজ না হয় তাহলে তো অ্যাটলিস্ট নিজেদের মাথায় চালাতে হবে, তাই বলছি"।
রাঘব বললেন "মিশন ফেইল হলে তা ছাড়া তো কোন উপায় নেই"।
আব্বাস বলল "দোষটা আপনারই রাঘব স্যার। আপনাকে কে বলতে বলেছিল জামাল পাশা উইদাউট সিকিউরিটি মর্নিং ওয়াকে বেরোন? আপনি তো জানেন সায়ক কী ধরণের পাগল"!
রাঘব বললেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন তো সব দোষই আমার। সে তো বলবেই। আমারই তো সব দোষ। আর ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সে যে এরকম পাগল অফিসার রাখা হয়েছে তার কোন দায়িত্ব নেই"।

সায়ক রাঘবের কথার উত্তর না দিয়ে বলল "ইসলামাবাদ ইজ সাচ আ বিউটিফুল প্লেস আকাশ। ভাবতেই কষ্ট হয় পৃথিবীর সব থেকে শয়তান লোকগুলো এখানে থাকে"।

রাঘব বললেন "ওয়েল, শয়তান শব্দটা রিলেটিভ শব্দ সায়ক। আমাদের দেশেও শয়তানের কমতি নেই। সেই লোকটার কথা মনে আছে তো যে এক মুসলিম শ্রমিককে মেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জান্তব উল্লাস করছিল? কিংবা সেই লোকগুলো, যারা বিফ খাচ্ছিল বলে একটা লোককে মেরেই ফেলল? এই ধরণের শয়তানগুলোরও কিন্তু সাপোর্টার কম নয়। আর এদের জন্যও পাকিস্তান এত সুবিধা পেয়ে যায় ইন্ডিয়ান মাইনরিটিদের প্ররোচিত করার"।

সায়ক মাথা নাড়ল "তা ঠিক। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি আমি মুসলিম সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অন্য কোন ধর্মের সন্ত্রাসবাদকে উস্কানি দি, তার থেকে বোকামি আর কিছু হয় না"।

রাঘব বললেন "ইন্ডিয়া চালানো কি এতটাই সহজ রে ভাই? এতগুলো ধর্ম, জাতি, ভাষা। গোটাটাই সুতোর উপরে ব্যালান্স করে চালানোর মত ব্যাপার। এর মধ্যে কোন সুতোয় একটু বেশি টান পড়লেই আর দেখতে হবে না..."

সায়ক বলল "সমস্যা হল ইউ কান্ট কন্ট্রোল পলিটিশিয়ান্স স্যার। দে উইল ডু, হোয়াট দে ওয়ান্ট টু ডু। দে অলসো হ্যাভ প্রোপাগান্ডা। আমাদের মত দেশ, যারা একই সাথে এতগুলো স্টেটের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে, সেখানে যদি এই ধরণের ক্যালাসনেস চলে তাহলে যা হবার তাই হচ্ছে। দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে টু ডিল উইথ মাইনরিটিস ইন আ কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া"।

আকাশ বলল "মরার জন্য তো সেনারা আছেই স্যার। ভোটের সময় এরাই আমাদের লাশ নিয়ে বলবে দেখো বর্ডার পে হামারা সেনা খড়া হ্যায়। যেন নিজেরা কত খাড়া হয়েছে। দিস পলিটিশিয়ান্স সাক"।

রাঘব বললেন "থ্যাঙ্ক গড কথাটা তুমি পাকিস্তানে বসেই বলছ, নইলে এই কথাটা বলার জন্য তোমাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হত"।

সবাই জোরে হেসে উঠল।

রাঘব সতর্ক গলায় বললেন "সায়ক, আমরা এসে গেছি"।

সায়ক ঘড়ি দেখল, "আপনি শিওর জামাল পাশা এই রাস্তা ধরে যায়?"

রাঘব বললেন "হান্ড্রেড পারসেন্ট। নাও টেল মি হোয়াট টু ডু"।

সায়ক আকাশের দিকে তাকাল "মাস্ক পরে নাও। ক্লোরোফর্ম রেডি কর"।

রাঘব বললেন "আবার নিজের মুখেই দিও না আকাশ। তাহলে আর দেখতে হবে না"।
আকাশ বলল "কী যে বলেন, প্লিজ হাসাবেন না"।
সায়ক বলল "গাড়িটা গাছটার তলায় দাঁড় করান রাঘব"।
রাঘব গাড়িটা পার্ক করলেন। ভোর হচ্ছে। সায়ক বলল "দুটো আর্মি চৌকিই এখান থেকে অনেকটা দূরে। দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস"।
রাঘব বললেন "গাড়ির মধ্যে করে জামাল পাশাকে নিয়ে যাওয়াটা একটু টেনশনের হবে"।
সায়ক বলল "কিচ্ছু হবে না। উই হ্যাভ টু টেক দ্য রিস্ক। নাও এভ্রিওয়ান কিপ কোয়ায়েট এন্ড ওয়েট"।
শ্বাসরুদ্ধ করে বসে থাকল ওরা তিনজন।
মিনিট দশেক পরেই জামাল পাশাকে আসতে দেখা গেল। ছোট খাট গোলগাল চেহারা। ট্র্যাক স্যুট পরে জগিং করতে করতে আসছেন।
সায়ক বলল "নাও। আকাশ, গেট রেডি। পাশা কাছে এলে আমি বললেই সবাই গাড়ি থেকে নামবে"।
জামাল নিকটবর্তী হচ্ছিলেন।
অতর্কিত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সায়করা।
ঠিক এই সময় দ্রুত গতিতে একটা গাড়ি থেকে চার পাঁচজন লোক জামাল পাশাকে পরপর গুলি করে চলে গেল।
রক্তাক্ত জামাল পাশা রাস্তায় পড়ে রইলেন।
সায়ক বলল "শিট! শিট! স্টার্ট দ্য কার। কুইক!!!"

২২।
কলকাতা অফিসে ঢুকেই তুষার দেখতে পেলেন সোমেন এবং অনিন্দিতা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তুষারকে দেখে সোমেন উঠে দাঁড়ালেন।
তুষার মাথা নাড়লেন, "আপনাদের সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা আমার নেই। আমি কী বলব কিছুই বুঝতে পারছি না"।
সোমেন বললেন "দাদা বলছে ওরা নাকি মিনির বিয়ে দিয়ে দিয়েছে"।
তুষার বিস্মিত হয়ে বললেন "সেকী!"
সোমেন বললেন "হ্যাঁ"।
তুষার বললেন "কোথায় আছে কিছু বলেছে?"

সোমেন মাথা নাড়লেন "না। তবে আমার ফোন থেকে একটা নাম্বারে ফোন করেছিল"।

তুষার বললেন "দেখি নাম্বারটা"।

সোমেন ফোনটা দিলেন।

তুষার তীক্ষ্ণ চোখে নাম্বারটা দেখে বললেন "+৮৮০? এ তো বাংলাদেশের নম্বর। এর মধ্যে বাংলাদেশে পাচার হয়ে গেছে?"

অনিন্দিতা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছিলেন। তুষারের কথা শুনে বললেন "যে লোকটা মেয়েটাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করল, সে কী করে ওর এত বড় সর্বনাশ করতে পারে বলতে পারেন?"

তুষার বললেন "পারে। করতে পারে। অরগানাইজড ব্রেইন ওয়াশ যে কত কিছু করতে পারে তার কোন ধারণা নেই আপনাদের। আমার মনে হয় হাইজ্যাকিং এর ঘটনার পিছনে আপনার মেয়ে আমাদের হেল্প করেছে জেনেই ওরা এই কাণ্ডটা করেছে। সব থেকে বড় ব্যাপার কী জানেন তো? আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না ওদের নেটওয়ার্কটা। কে কে আছে ওদের অরগানাইজেশনে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনাদের মেয়ের কিডন্যাপিংটা আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ লিড হতে পারে"।

সোমেন তুষারের হাত ধরে বললেন "আমরা কিছুই বুঝি না স্যার, এই কিছুদিন আগেও আর পাঁচটা সাধারন ঘরের মানুষের সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য ছিল না বিশ্বাস করুন। আপনি যেভাবেই হোক, আমাদের মেয়েকে এনে দিন আমার কাছে"।

তুষার হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন না। সোমেনের হাতে চাপ দিয়ে বললেন "চিন্তা করবেন না। আপনারা বাড়ি যান। আমি দেখছি কী করা যায়। কোন ফোন এলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আমিও কোন আপডেট পেলে আপনাদের জানাব। আমি নাম্বারটা নোট করে নিচ্ছি। দেখছি কী করা যায়"।

সোমেন ক্লান্ত শরীরে অনিন্দিতার পাশে বসে পড়লেন।

তুষার হাঁটতে হাঁটতে অফিসের ভিতর ঢুকলেন। পীযূষ বসে ছিলেন। তুষার বললেন "একটা নাম্বার দিচ্ছি, ট্রেস কর। এদেশের না, বাংলাদেশের। দরকার হলে ঢাকায় রাসেলকে ফোন করে হেল্প নাও"।

পীযূষ বললেন "ওকে স্যার"।

তুষার নিজের ফোনটা বের করে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করলেন। একবার রিং হতেই ধরলেন মন্ত্রী "বল তুষার"।

"স্যার, ব্যাড নিউজ আছে"।

"আর নিউজ! কোনটা গুড নিউজ বলতে পারবে? একটাও তো ভাল নিউজ পাচ্ছি না। খানের কিছু হয় নি তো?"

"না স্যার। খানের জ্ঞান ফিরেছে"।

"এই তো ভাল নিউজ দিলে। ব্যাড নিউজটা কী?"

"স্যার, হাসান মাকসুদের ভাইঝিকে কিডন্যাপ করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঢাকার মিনিস্ট্রির সঙ্গে আমাদের কন্ট্যাক্ট করতে হবে। ওদের হেল্প ছাড়া মেয়েটাকে উদ্ধার করা যাবে না"।

"এর মধ্যে আবার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ঢুকছে কেন? আমি নিজে ঢাকার মিনিস্ট্রিতে কন্ট্যাক্ট করে বলে দিচ্ছি, ওরা যা করার করুক"। মন্ত্রীর গলায় স্পষ্ট বিরক্তি।

"স্যার আপনি বুঝতে পারছেন না। কাশ্মীরে এদের অর্গানাইজেশন সিরিয়াল ব্লাস্ট করছে। ইন্ডিয়ার আর কোন শহরে ওদের কোন লিংক আছে নাকি তাও আমরা কিচ্ছু জানি না। আমরা ভেবেছিলাম হাইজ্যাকিংয়ের পরে ওদের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আসলে কিছুই শেষ হয় নি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই লিডটা কত ইম্পরট্যান্ট"।

ওপাশে খানিকটা নীরবতা। তারপর ভেসে এল "তুমি কী করতে চাইছ?"

"স্যার আমি চাইছি ওদের ট্র্যাক করে আমাদের এন এস জি ফোর্স দিয়ে বাংলাদেশে একটা অপারেশন করতে"।

"দিমাগ খারাব হো গয়া হে তুমহারা? কী বলছ বুঝতে পারছ?"

"স্যার, বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু দেশ। ওরা আমাদের প্রচুর হেল্প করেন। আমরা যদি পি এম লেভেলে ওদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কন্ট্যাক্ট করি, কাজ হয়ে যেতে পারে"।

"সরি তুষার। আমি এ ব্যাপারে তোমায় কোন হেল্প করতে পারব না"।

"স্যার প্লিজ স্যার। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা তো বাংলাদেশের জন্যও গ্রেটের ব্যাপার। এত ভয়ংকর সব টেররিস্ট..."

"আমি পরে ফোন করছি। মিটিং আছে একটা"।

ফোনটা কেটে দিলেন মন্ত্রী।

তুষার কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থাকলেন। তুষার পীযূষের ঘরে ঢুকে বললেন "কী হল? কোন আপডেট?"

পীযূষ অবাক গলায় বললেন "এত তাড়াতাড়ি স্যার?"

তুষার বললেন "রাসেলকে ফোন করেছ?"
পীযূষ বললেন "জ্বী স্যার। জানাচ্ছে বলল"।
তুষার অধৈর্য গলায় বললেন "কী জানাচ্ছে! কতক্ষণ লাগে?"
পীযূষ বললেন "স্যার এক ঘন্টা তো দিন"।
তুষার চেয়ারে বসে পড়লেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "স্কাউন্ড্রেলটার আবার মুখোমুখি হতে হবে ভেবেই বিরক্ত লাগছে আমার।"

২৩।
ঘর ভর্তি ফুলের গন্ধ।
মিনিকে একটা জবরজং শাড়ি পরিয়ে দিয়েছেন ভদ্রমহিলা। মিনির বমি পাচ্ছিল।
বাড়িতে খুব বেশি লোক নেই। তবে পাড়ার কয়েকজন মহিলা আছেন।
নাজিব যখন বাসর ঘরে ঢুকল তখন রাত দেড়টা। মিনি খাটের কোণে সিঁটিয়ে গেল।
নাজিব শেরওয়ানিটা খুলে ফেলল। স্যান্ডো গেঞ্জী পরে খাটে বসে বলল "উফ, আজকে কী গরম! কতটা রাস্তা এলাম বল! সেই কলকাতা থেকে যশোর"।
মিনি উত্তর দিল না।
নাজিব বলল "তোমার নতুন নামটা জানো তো?"
মিনি এরও উত্তর দিল না।
নাজিব বলল "আয়েশা বেগম। সুন্দর না?"
মিনি বলল "আমি বাড়ি যাব"।
নাজিব বলল "সে তো যাবেই। তবে এখন না। কয়েক দিন আমরা সংসার করি, আমাদের দু চারটে ছোট ছোট বেবি হোক। তারপর যাবে। হাসান চাচা তো বলেন, আমাদের কাজই হল যত বেশি সম্ভব বংশবৃদ্ধি করা। গোটা পৃথিবীটাতে আমাদের লোক জনে ভরে দিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব"।
মিনি বলল "আমার মাথা ধরেছে"।
নাজিব বলল "আমার পাশে এসে বস। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি"।
মিনির আরও সিঁটিয়ে গেল।
নাজিব খাটে উঠে মিনিকে জড়িয়ে ধরতে গেল।
মিনি তড়িঘড়ি খাট থেকে নেমে গেল।

নাজিব হাসল "একী! তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কেন? জানো না, আজ থেকে আমরা এক দেহ এক প্রাণ?"

মিনি বলল "আমি চ্যাঁচাব"।

নাজিব বলল "সে তো চেঁচাবেই। চেঁচানো মানে তো ভাল। আম্মাও খুশি হবে তুমি চ্যাঁচালে। বুঝবে তুমি ভেজাল মাইয়া না। আজকাল তো চারদিকে ভেজাল মাইয়ায় ভরে গেছে। পর্দা বলে কিছু নাই"।

মিনি হতভম্ব হয়ে বলল "এ আপনি কী বলছেন?"

নাজিব বলল "আমি বলব না? আমিই তো বলব? আমি ছাড়া কে বলবে? আমি তোমার স্বামী না? শোন, তুমি তো হিন্দু, মানে হিন্দু ছিলে, অনেক কিছুই জানো না। তোমাকে অনেক কিছু শেখাবো। আমি শেখাবো, আম্মা শেখাবে, চাচা চাচী শেখাবে। আমাদের মেয়েদের সব থেকে বড় কথা কী জানো তো? লজ্জা হায়াত। হিজাব পরা অভ্যাস করবে। পর পুরুষের চোখের দিকে তাকাবে না। সব সময় মাটিতে চোখ থাকবে। মনে রাখবে জন্ম থেকেই মেয়ে মানুষরা ছেলেদের জন্য তৈরী হয়েছে। আমার আবার অত ওয়েস্টার্ন মেয়েছেলে পছন্দ না। তবে তুমি চাইলে ইনার গারমেন্ট ওয়েস্টার্ন ড্রেস এনে দিতে পারি। বাইরে কিন্তু ট্রেডিশনালই পরতে হবে। তুমি বুঝতে পারছ তো আমি কী বলতে চাইছি?"

মিনি দরজার ছিটকিনি খুলে ঘরের বাইরে গেল। বেশ কয়েকজন মহিলা গল্প করছিলেন। মিনিকে দেখে সবাই আগ্রহী চোখে তাকালেন। নাজিবের মা আহ্লাদী গলায় বললেন "ওই দেখো, মেয়ের লাজ হয়েছে। তা তো হবেই, বাসরে একটু আধটু লজ্জা হবেই। যাও মা, স্বামীর কাছে যাও। অনেক কিছু শেখাবো তোমাকে কাল থেকে। হাসানভাইয়ের ইচ্ছাও ছিল তোমাকে সব কিছু শেখাবে"।

মিনি মাথা নিচু করে বলল "আমি ওর সঙ্গে শুতে পারব না। আমার শরীর খারাপ হয়েছে"।

ঘরে যাও বা বাকিরা কথা বলছিল সবাই চুপ করে গেল। নাজিবের মা উঠে মিনির কাছে এসে কড়া গলায় বললেন "তুমি মিথ্যা কথা বলছ"।

মিনি বলল "বিশ্বাস না হলে বাথরুমে চলুন। হাত দিয়ে দেখে নিন রক্ত বেরোচ্ছে কিনা"।

নাজিবের মা কয়েক সেকেন্ড কড়া চোখে মিনির দিকে তাকিয়ে তার হাত ধরে নাজিবের ঘরে ঢুকলেন।

নাজিব বলল "দেখেছ মা, তোমার বউ মা কত লাজুক। শুধু ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আটকে রাখাই যাচ্ছে না"।

নাজিবের মা থমথমে গলায় বললেন "তুই বাইরের ঘরে ঘুমা। ওর সঙ্গে আজ ঘুমাতে হবে না। ওর শরীর এখন অপবিত্র"।
নাজিব হতভম্ব হয়ে একবার মায়ের দিকে, আরেকবার মিনির দিকে তাকিয়ে রইল।
নাজিবের মা বললেন "যা বাইরে যা"।
নাজিব বিশ্বাস করতে না পারার মুখ নিয়ে ঘরের বাইরে গেল।
নাজিবের মা বললেন "বস"।
মিনি খাটে বসল।
নাজিবের মা বললেন "শোন মেয়ে, তোমার কপাল খুব ভাল। আমি ভেবেছিলাম তুমি মিথ্যা বলছ। কিন্তু তুমি যদি ভেবে থাকো এখান থেকে পালাবে, তাহলে তুমি ভুল করবে। মনে থাকে যেন। ঘুমিয়ে পড়। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও"।
নাজিবের মা বেরিয়ে গেলেন।
মিনি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে খাটে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

২৪।
ইসলামাবাদে নিজেদের ডেরায় ফিরে হাঁফাচ্ছিল তিন জনই।
রাঘব মেঝেতেই বসে পড়েছিলেন। বললেন "উই হ্যাভ টু লিভ ইসলামাবাদ অ্যাস আরলি অ্যাস পসিবল। অন্তত সায়ক তোমার এখানে থাকাটা কিছুতেই ঠিক হবে না। খুব সম্ভবত পাকিস্তানে আর্মি নেমে যাবে আজকেই"।
সায়ক বলল "হ্যাঁ তা তো নামবেই"।
রাঘব বিস্মিত গলায় বললেন "কিন্তু সায়ক, পাশাকে তো সবাই চাইছিল। ইভেন পাকিস্তান আর্মিও পাশাকে জেতাতে সব রকম চেষ্টা করছিল। তাহলে এটা কেন হল?"
সায়ক মাথা নাড়ল "পাকিস্তানের মত দেশে অনেক কেনরই উত্তর পাওয়া যায় না ভাটিয়া সাব। এভ্রিথিং ইজ কমপ্লিকেটেড হিয়ার। আর্মির সঙ্গে পলিটিশিয়ানদের সমানে সমানে টক্কর চলে এখানে। দাউদ থেকে শুরু করে লস্কর, আল কায়েদা, হিজবুল, সবাইকেই পুষে রাখতে হয় ইন্ডিয়াকে শিক্ষা দিতে হবে বলে। শেষ মেশ যেটা হয়, এ সব কিছু করতে গিয়ে এদের নিজের দেশটারই বারোটা বেজে যায়"।

আব্বাস বললেন "অথচ গরিবি দেখো। ইসলামাবাদ এমন ঝকঝকে একটা শহর, কিন্তু কতগুলো বস্তি আছে গোটা শহর জুড়ে!"
রাঘব বললেন "গরিবি তো দুই দেশেই আছে ভাই। ইনফ্যাক্ট সাব কন্টিনেন্টের সব খানেই। থার্ড ওয়ার্ল্ড মানেই গরিবি। কিন্তু এখানকার পলিটিশিয়ানদের তো সেটা নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। সবাই পড়ে আছে রাম রহিমের কাটাকাটি নিয়ে"।
সায়ক পকেট থেকে রিভলভার বের করে মেঝেতে রেখে বলল "ভাটিয়া সাব, আমি একটা তৃতীয় শক্তির গন্ধ পাচ্ছি। মুজফফরাবাদেও খানিকটা আঁচ করেছিলাম। পাকিস্তান বা ইন্ডিয়া এখানে বড় ফ্যাক্টর না। আরও বড় কিছু একটা রাইজ করছে। মারাত্মক কিছু। পাকিস্তান বরাবরই বাঘের পিঠে সওয়ার ছিল। এবার বাঘটা বড় হয়েছে। আর তারা শুধু পাকিস্তান কেন, ছড়িয়ে পড়তে চাইছে সাব কন্টিনেন্টের সব খানেই"।
রাঘব ভ্রূ কুঁচকালেন "তুমি কী বলতে চাইছ?"
সায়ক বলল "হাসান মাকসুদ বেশ কয়েকবার মিডল ইস্টে গেছে ভাটিয়া সাব। প্যারিসে মাস ছয়েক আগে যে স্যুইসাইড অ্যাটাকটা হয়েছিল, তার সঙ্গে রিসেন্টলি শ্রীনগরে হওয়া টেররিস্ট অ্যাটাকের একটা অদ্ভুত মিল আছে। ইস্তানবুলের হোটেলে যে বোমা বিস্ফোরণটা হয়েছিল, তার সঙ্গে চাঁদনি চকের সেন্টিনেলে হওয়া বোম বিস্ফোরণেরও মিল আছে। দুটো ক্ষেত্রেই ইউজ হয়েছে ক্রিকেট বল সাইজের টাইমবোম। এগুলো সব কটাই সিকিউরিটি চেকিং ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে"।
রাঘব চিন্তিত গলায় বললেন "মাই গড। ইউ মিন..."
সায়ক হাসল "আপনি ঠিকই ধরেছেন ভাটিয়া সাব। নাও দে আর বিকামিং অ্যাগ্রেসিভ"।
আব্বাস চোখ কপালে তুলে বলল "আইসিস?"
সায়ক আব্বাসের দিকে তাকাল। বলল "দে আর টেরিফিকলি ডেঞ্জারাস। একই সঙ্গে অনেকগুলো স্লিপার সেল চালাচ্ছে, একবারে অশিক্ষিত লোকেদের নিয়ে নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত শিক্ষিত এবং প্রবলভাবে ব্রেইন ওয়াশড। এদের হাতে আছে অত্যাধুনিক অস্ত্র, মাথায় আছে মগজের পরিবর্তে ধর্মগুরুদের ফিড করে দেওয়া জেহাদ আর..."
সায়ক রাঘবের দিকে তাকাল। বলল "ভাটিয়া সাব, তুষার স্যারকে ফোন করতে হবে। যেভাবেই হোক ব্যবস্থা করুন"।

রাঘব মাথা নাড়লেন “আমি এখানে কোন ব্যবস্থা করতে পারব না সায়ক। ওরা সব আই এস ডি ট্র্যাপ করছে এখন। সিকিওর লাইনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব”।
সায়ক বলল “মেইল?”
রাঘব বললেন “কান্ট টেক রিস্ক। জামাল পাশা মার্ডারের কেসটা পাকিস্তান ইন্ডিয়ার ঘাড়ে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কীভাবে এখন বিন্দুমাত্রও রিস্ক নিই বল?”
সায়ক চিন্তামগ্ন হল।
রাঘব বললেন “তুমি যদি বল আমি একটা রুট বলতে পারি”।
সায়ক জিজ্ঞাসু চোখে রাঘবের দিকে তাকাল।
রাঘব বললেন “পেশোয়ার হয়ে আফগানিস্তান চলে যাও”।
সায়ক বলল “তারপর?”
রাঘব বললেন “আফগান গভর্নমেন্ট তোমাকে ইন্ডিয়া পৌঁছে দেবে”।
সায়ক বিরক্ত মুখে বলল “কী যে বলেন না ভাটিয়া সাব। এত কাণ্ড করে ইন্ডিয়া চলে যাব? তাহলে তো হয়েই গেল”।
রাঘব বললেন “তুমি ইন্ডিয়া না গেলে ওরা তোমায় যেখানে পাবে সেখানে মারবে সায়ক”।
সায়ক বলল “মারুক। মরতে আমি ভয় পাই না। আপাতত আজকে কোথায় যাওয়া যায় সেটা বলুন”।
রাঘব বললেন “রাওয়ালপিন্ডি। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি আর আফসান চলে যাও বাসে করে”।
সায়ক বলল “ওখানে গিয়ে কিছু না করে হাতে হাত রেখে বসে থাকব?”
রাঘব বললেন “এছাড়া উপায় নেই কোন”।
সায়ক বলল “আমাকে ইসলামাবাদেই থাকতে হবে ভাটিয়া সাব। আপনি বুঝতে পারছেন না। জামাল পাশাকে মারার রি অ্যাকশনটা দেখতে হবে তো”।
রাঘব বললেন “সেটা তুমি রাওয়ালপিন্ডিতে কাগজ পড়ে শুনে নিও। আমি বলছি শোন, তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও”।
সায়ক মুখ কালো করে বসে রইল।

২৫।

বীরেন চুপচাপ বসে ছিল আই সি ইউতে। রেহান এসে বীরেনের পাশে বসলেন। বললেন "বীরেন,তুমি জানো তুমি এখন একজন হিরো?"

বীরেন একটু কুঁকড়ে গেল "কী যে বলেন স্যার, আমার জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলে খান স্যারকে এভাবেই বাঁচাত"।

রেহান মাথা নাড়লেন। বললেন "বাঁচাত না বীরেন। আমি জানি। সবাই আগে নিজেকে বাঁচায়"।

বীরেন বলল "খান স্যার না থাকলে যে আমি আগেই মরে যেতাম স্যার। ওনার জন্যই তো আমি এখনও বেঁচে আছি"।

রেহান বললেন "তাতেও। এই দুনিয়ায় কেউ কারও না ভাই। এই যে শহরটা দেখছ, এই শহরে আমি বড় হয়েছি। আমার চাচা, ফুপা, খালু সবাই আমাদের পর করে দিয়েছে শুধুমাত্র আমি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের সার্ভিস করি বলে। পাড়ার লোকেরা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে..." রেহান চুপ করে গেলেন।

বীরেন বলল "কালকের ব্লাস্টটা কারা করালো স্যার?"

রেহান বললেন "কারা আর? এঁরা নিজেরাই করছে। ভাবছে এসব করে ইন্ডিয়ার থেকে আলাদা হতে পারবে। গর্দভগুলো জানেই না, ইন্ডিয়া আছে বলেই এঁরা এখনও বেঁচে আছে। দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দোজ পাকিস্তানি বাস্টার্ডস"; রেহান ফুঁসছিলেন।

বীরেন বলল "আমি তো শুনেছিলাম এখানের অনেকেরই পাকিস্তানে যাতায়াত আছে"।

রেহান বললেন "আছে তো। অনেকগুলো জায়গা আছে যেখান থেকে এখনও অনুপ্রবেশ ঘটছে"।

বীরেন অবাক গলায় বলল "আর্মি কিছু করতে পারছে না?"

রেহান বললেন "করছে। কয়েকটাকে মারছেও। বাট দে আর লাইক গ্রুপ অফ জম্বিস। গেম অফ থ্রোনস দেখেছ?"

বীরেন হাসল "হ্যাঁ"।

রেহান বললেন "এঁরা হল সেই হোয়াইট ওয়াকারদের মৃত সেনার দল। এঁরা নিজেরাও জানে না এঁরা কবে মরে গেছে। কিন্তু অদ্ভুত এক টানে চলে যাচ্ছে নিজেদের দেশটার সর্বনাশ করতে"।

সিস্টার এসে বললেন "আশরফ খানের সঙ্গে দেখা করতে পারেন আপনারা। একজন যান"।

রেহান বললেন "যাও, তুমি দেখা করে এসো"।
বীরেন মাথা নাড়ল "না না স্যার, তা কী করে হয়? আপনি সিনিয়র। আপনি যান। আমি ওয়েট করছি"।
রেহান বললেন "আচ্ছা বেশ। দেন ওয়েট কর মি"।
রেহান উঠলেন। দরজা ঠেলে ঢুকলেন।
খানের পেটে ব্যান্ডেজ করা। মাথার কাছে রাখা মনিটরে বিভিন্ন শারীরিক তথ্য ফুটে উঠছে।
রেহান হাসলেন "গুড মর্নিং অফিসার। এখন কেমন আছেন?"।
আশরফ প্রত্যুত্তরে হাসলেন। বললেন "বুঝতে পারছি না। এভাবে তো কোনদিন থাকতে হয় নি"।
রেহান বললেন "বীরেন না থাকলে আজ হয়ত আপনাকে বাঁচানো যেত না"।
আশরফ বললেন "ও কোথায়? থ্যাঙ্কিউ বলে দিও আমার পক্ষ থেকে"।
রেহান বললেন "পাঠাচ্ছি। আছে বাইরেই। আপনাকে নিয়ে আসার পর থেকে এখানেই ঠায় বসে ছিল"।
আশরফ বললেন "ওরা আমাদের ফলো করছিল রেহান। শ্রীনগর ছাড়ার পরে আমার খানিকটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মনে হয়েছিল অতটা সাহস হয়ত ওরা পাবে না"।
রেহান বললেন "কারা হতে পারে বলে আপনার মনে হয় আশরফ?"
আশরফ বললেন "জানি না। তুষার স্যার কোথায়?"
রেহান বললেন "কলকাতায়। আরেক ঝামেলা হয়েছে সেখানে"।
আশরফ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।
রেহান বললেন "একটা কিডন্যাপিং এর..."
রেহানের কথা শেষ হবার আগেই সিস্টার এসে বললেন "স্যার, এর বেশি কথা বলাবেন না ওঁকে দিয়ে। প্লিজ"।
আশরফ সিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন "প্লিজ সিস্টার। লিভ আস অ্যালোন"।
সিস্টার বিরক্ত মুখে বেরিয়ে গেলেন।
আশরফ বললেন "কে কিডন্যাপ হয়েছে?"
রেহান বললেন "হাসান মাকসুদের ভাইঝি"।
আশরফ অবাক চোখে রেহানের দিকে তাকালেন।

সিস্টার ডাক্তারকে নিয়ে ঢুকলেন। ডাক্তারবাবু রেহানকে বললেন "প্লিজ স্যার। ওঁর সঙ্গে"...

রেহান হাত তুললেন। আশরফের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি আসছি অফিসার"।

বীরেন বাইরেই অপেক্ষা করছিল। রেহান বললেন "যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখা করে আসো। সিস্টার আর ডাক্তার দুটোই মহা খরুস"।

বীরেন ঢুকল। সিস্টার বললেন "আর না। আবার বিকেলে। আপনি এখন আসবেন না প্লিজ"।

আশরফ বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল "থ্যাঙ্কস বীরেন। থ্যাংকস ফর সেভিং মাই লাইফ"।

বীরেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সিস্টার তার দিকে কড়া চোখে তাকালেন। বীরেন বেরিয়ে বাইরে এল।

রেহান হাসলেন "দেখলে? কী বলেছিলাম?"

বীরেনও হেসে ফেলল "সত্যিই তাই"।

রেহান বললেন "চল, আমার বাড়িতে চল"।

বীরেন ইতস্তত করে বলল "না না স্যার, কী যে বলেন, আমি গেস্ট হাউজে যাই বরং"।

রেহান বীরেনের হাত ধরলেন "কাশ্মীরি আতিথেয়তা কী তা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই বাচ্চা, চল চল। কোন কথা শুনব না"।

২৬।

জ্যোতির্ময়কে তার সেল থেকে বের করে এনে ইন্টারোগেশন রুমে আনা হয়েছে।

তুষার তিনটে চেয়ার রাখতে বলেছিলেন। সোমেনরা বেরিয়ে গেছিলেন, তুষার আবার ফোন করে তাদের ডেকেছেন। জ্যোতির্ময়ের সামনে সোমেন, অনিন্দিতা এবং তুষার বসলেন।

জ্যোতির্ময় বাকি দুজনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তুষারকে বললেন "অনেক দিন পরে দেখা হল, কী বলুন অফিসার?"

তুষার বললেন "বেশিদিন নয়। আপনাদের কর্মকাণ্ডই এমন। চুপচাপ যে অন্ধকূপে রেস্ট নেবেন, তারও উপায় নেই। নিজের ভাইঝিকেই কিডন্যাপ করালেন"।

জ্যোতির্ময় মাথা নিচু করে নিজের পায়ের নখ দেখতে দেখতে বললেন "আমি মিনিকে কিডন্যাপ করাই নি। আপনাদের কোন একটা ভুল হচ্ছে। আমি তো এখানেই ছিলাম। এখান থেকে কীভাবে অপারেট করব বলতে পারেন?"
সোমেন বললেন "তুই তো চিনিস দাদা ওদের, বল না মিনিকে ছেড়ে দিতে"।
জ্যোতির্ময় সোমেনের দিকে তাকালেন "ওরা আমার কথা শুনবে কেন?"
সোমেন বললেন "তুই ওদের মাথা বলে"।
জ্যোতির্ময় কয়েক সেকেন্ড শান্ত চোখে সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "এদের বল আমাকে ছেড়ে দিতে। আমি সন্ধ্যের মধ্যে মিনিকে বাড়িতে এনে দিচ্ছি"।
অনিন্দিতা বিভ্রান্তের মত তুষারের দিকে তাকালেন।
তুষার জ্যোতির্ময়কে বললেন "তা কোথায় ছাড়তে হবে আপনাকে?"
জ্যোতির্ময় বললেন "আপনি রাজি থাকলে বলুন। বাকিটা বলে দিচ্ছি"।
তুষার বললেন "নিজের ভাইঝিকে কিডন্যাপ করিয়ে দেশকে ব্ল্যাকমেল করাচ্ছেন আপনি। আপনার লজ্জা লাগে না হাসান মাকসুদ?"
জ্যোতির্ময় বললেন "আপনি আমার ভাই আর ভাইয়ের বউকে নিয়ে এসে আমার সামনে বসিয়েছেন যাতে আমি আবেগে দ্রবীভূত হয়ে আপনাদের সাহায্য করি। আপনার লজ্জা লাগে না তুষার রঙ্গনাথন?"
তুষার স্থির চোখে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি আপনার ফ্যামিলিকে হেল্প করতে চেয়েছি, আশা করি আপনি এটা ভুলে যাবেন না"।
জ্যোতির্ময় বললেন "হেল্প করছেন? হুহ"!
তুষার সোমেনের দিকে তাকালেন "আপনারা এবারে বাইরে অপেক্ষা করুন। ওঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে"।
সোমেন এবং অনিন্দিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
তুষার বললেন "দেখুন হাসান, এ জিনিসটা বার বার করতে ভাল লাগে না, কিন্তু আপনি সব কাজ করছেন যার জন্য আমাদের হাতে আর কোন অপশনও থাকে না। আপনার হাতে বারো ঘন্টা সময় আছে। এই বারো ঘন্টায় আপনি আমাদের জানাবেন আপনার ভাইঝি মিনিকে কীভাবে এ দেশে ফেরত আনা যায়। নইলে আমাদের পক্ষে আপনার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। ওঁর মৃত্যুটাও আমরা আপনার সামনেই ঘটাব। একটু একটু করে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হবে ওঁকে। আশা করি আপনার এতে কোন কষ্ট হবে না"।

জ্যোতির্ময় কললেন "এই তো পারেন আপনারা। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতেই পারেন। আর কী পারেন?"
তুষার বিদ্রুপের সুরে কললেন "তাই নাকি? এটা শুধু আমরাই করি? আর আপনারা কী করেন শুনি? মিনিকে তুলে নিয়ে গেল যারা তারা ঠিক কী হিসেবে ওকে নিয়ে গেল আমাকে বলবেন প্লিজ?"
জ্যোতির্ময় কললেন "মিনির জন্য আমি উপযুক্ত পাত্র দেখে রেখেছিলাম। ওর সঙ্গেই ওর বিয়ে হয়েছে"।
তুষার কললেন "কেমন উপযুক্ত পাত্র শুনি?"
জ্যোতির্ময় কললেন "ধর্মশিক্ষায় ভাল, নীতি শিক্ষায় ভাল, বনেদি পরিবার। আর কী চাই?"
তুষার কললেন "বাহ। আর মেয়েটার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু থাকবে না?"
জ্যোতির্ময় বললেন "মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছাটা বড় কথা নয়। বংশ বিস্তারটা বড় কথা"।
তুষার তেতো মুখে কয়েক সেকেন্ড জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে কললেন "আপনি গত তিন বছরে দুবার ইরাকে গেছেন। সিরিয়ায় গেছেন। কীভাবে গেছেন? কে নিয়ে গেছে আপনাকে?"
জ্যোতির্ময় অন্য দিকে তাকিয়ে কললেন "আপনারা অনেক বড় ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন। আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? নিজেরাই খুঁজে বার করুন না"।
তুষার কললেন "নিরীহ মানুষদের মেরে আপনারা কী মজা পান মাকসুদ?"
জ্যোতির্ময় কললেন "কাউকে অকারণে মারা হয় না। প্রত্যেকের এ পৃথিবীতে আসা এবং যাওয়া, পূর্ব নির্দিষ্ট"।
তুষার বিদ্রুপের সুরে কললেন "আপনাকে একটা চ্যানেল খুলে দিতে হবে দেখছি। সেখানে বসে বসে মানুষের কুষ্ঠী বিচার করবেন"।
জ্যোতির্ময় চুপ করে বসে রইলেন। তুষার চেয়ার থেকে উঠে ইন্টারোগেশন রুম থেকে বাইরে এলেন।
সোমেন এবং অনিন্দিতা অধীর আগ্রহে তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকে দেখে সোমেন কললেন "কোন আশা আছে অফিসার?"
তুষার মাথা নাড়লেন, "আপনারা বাড়ি যান। সাবধানে থাকবেন। কোন আপডেট এলে জানাবো"।

কথাটা বলে দাঁড়ালেন না তুষার। পীযূষের রুমে ঢুকলেন। পীযূষ লাঞ্চ করছিল। তুষার বললেন "রাসেলের সঙ্গে যোগাযোগ হল?"

পীযূষ বলল "হয়েছে। এখনও একজ্যাক্ট লোকেশন ট্রেস করা যায় নি স্যার"।

তুষার কয়েক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে ফোন বের করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করলেন। ফোন একবার রিং হতেই কেটে দিলেন মন্ত্রী। তুষার থমথমে মুখে বসে রইলেন।

পীযূষ বললেন "এনি প্রবলেম স্যার?"

তুষার বললেন "প্রবলেম ই প্রবলেম পীযূষ। ভাল খবর কোথায়?"

ফোন বাজছিল। পীযূষ নাম্বারটা দেখে বললেন "এই তো রাসেল ফোন করছে"।

তুষার বললেন "দাও আমাকে দাও"।

পীযূষ ফোনটা এগিয়ে দিল। তুষার ধরে বললেন "রাসেল?"

"বলছি। আপনি কে বলছেন?"

"আমি তুষার রঙ্গনাথন বলছি"।

"ওহ স্যার। বুঝেছি"।

"নাম্বারটা আমিই ট্রেস করতে দিয়েছিলাম রাসেল, এনি আপডেট?"

"আপডেট বলতে নাম্বারটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডারের কাছের কোন গ্রামে আছে, স্পেসিফিকালি বলতে গেলে যশোরের কাছে। কিন্তু এর বেশি সেভাবে ট্রেস করা যাচ্ছে না স্যার"।

"ওকে রাসেল। যশোর বলতে বনগাঁ থেকে কাছে হবে?"

"হ্যাঁ স্যার"।

"নাম্বারটা মুভ করেছে কোথাও না একই জায়গায় আছে?"

"হু... না স্যার। আপাতত মুভ করে নি কোথাও"।

"ওকে। মুভ করলে অবশ্যই জানাবে আমাদের"।

"শিওর স্যার। খুদা হাফেজ"।

"খুদা হাফেজ"।

ফোনটা রাখলেন তুষার। নিজের ফোন বের করে আবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করলেন। এবারে মন্ত্রী কাটলেন না। ফোনটা পুরো রিং হয়ে গিয়ে নিজে থেকেই কেটে গেল।

২৭।

ভোরে দরজা ধাক্কার শব্দে মিনির ঘুম ভাঙল।

চোখ খুলে খাটে উঠে বসল সে। গলা তুলে বলল "কে?"

"আমি নাজিব। দরজা খোল"।

মিনি বলল "পরে আসুন"।

"আরে দরজা খোল, আমাকে বেরোতে হবে। টাকার ব্যাগ ঘরের ভিতর"।

মিনি উঠে দরজা খুলল।

নাজিব প্যান্ট শার্ট পরে ছিল। ঘরে ঢুকে আলমারি খুলল।

মিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

নাজিব মানি ব্যাগ পকেটে রেখে বলল "তোমার শরীর খারাপ কতদিন থাকবে?"

মিনি বলল "আমি জানি না"।

নাজিব খাটে বসল। বলল "দেখো, কাল রাতের জন্য আমি অনেক সরি"।

মিনি বলল "তুলে আনার জন্য সরি না? আমার মত না নিয়ে জোর করে বিয়ে করার জন্য সরি না?"

নাজিব বলল "হাসান সাহেব বলেন হিন্দু ধর্মেও বল পূর্বক বিয়েতে কোন বাঁধা নেই। আর আমাদের ধর্মে তো নেইই"।

মিনি বলল "তা তো বটেই। সব ধর্মেই তো মেয়েরা বল প্রয়োগ করারই মেটিরিয়াল"।

নাজিব বলল "তোমার চাচাজানের ইচ্ছাতেই কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে সেটা জানো তো?"

মিনি এবার ভাল করে নাজিবের দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ নাজিবের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনাকে মানুষের মতই দেখতে বটে"।

নাজিব হো হো করে হেসে বলল "কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি অমানুষের মত দেখতে হব?"

মিনি উত্তর দিল না।

নাজিব হিস হিস করে বলল "তোমার নসীব ভাল। তুমি হাসান মাকসুদের ভাইয়ের মেয়ে। নইলে বেয়াদপির জন্য তোমায় রেপ করে নদীর জলে ফেলে দিতাম"।

মিনি বলল "রোজ ক'টা মেয়েকে রেপ করে নদীতে ফেলেন?"

নাজিব মিনির দিকে আঙুল তুলে বলল "হিসাব চাই তোমার?"

মিনি বলল "কাপুরুষের মত পরের মেয়েকে যারা তুলে নিয়ে আসে তাদের আমি মানুষ বলে মনে করি না। হিসাব চায় তো মানুষের কাছে"।
নাজিব বলল "কাপুরুষের কী দেখলে? শহরের মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। এতে কাপুরুষের কী আছে? তোমাকে নিয়ে বর্ডার অবধি পার হয়েছি। আর শোন মেয়ে বেশি লাফালাফি কোর না। কাল রাতে যে মাংস খেয়েছ তা গরুর মাংস, বুঝেছ?"
বিরাট কোন বাহাদুরির কথা বলেছে এমন করে নাজিব কথাটা বলল।
মিনি হেসে ফেলল।
নাজিব বলল "হাসছ কেন?"
মিনি বলল "গরুর মাংস খেয়েছি তা কি এমন বিরাট ব্যাপার? কলকাতায় তো আমি প্রায়ই আমার বন্ধুর সঙ্গে গরুর মাংস খেতাম। গরুর মাংসে জাত যায় নাকি? কে বলে এসব?"
নাজিব চোখ বড় বড় করে মিনির দিকে তাকাল।
মিনি বলল "আমিও শুনেছি যারা দেশভাগের পরে বাংলাদেশে থেকে গিয়েছিল তাদের গো মাংস জোর করিয়ে খাইয়ে ধর্মান্তরিত করা হত। কিন্তু আপনি বা আপনাদের মত কিছু মাথামোটা ধর্মান্ধ মানুষ যদি ভেবে থাকেন কোন প্রাণীর মাংস খাইয়ে ধর্ম বদল করা যায়, তাহলে আপনারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন"।
নাজিব আরও কিছুক্ষণ মিনির দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
মিনি দরজা বন্ধ করে জানলা খুলল। বাইরে আলো ফুটেছে।
গতকাল গোটা দিন দুঃস্বপ্নের মত গেছে। মাথা কাজ করছিল না।
মিনি মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করল। সে বুঝতে পারছিল হতবুদ্ধি হওয়া মানে সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া। সে জোরে জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল। জেঠুই শিখিয়েছিল খুব টেনশন হলে জোরে জোরে শ্বাস নিতে এবং ছাড়তে হয়।
মিনির হঠাৎ করে মায়ের মুখটা মনে পড়ে গেল।
কান্না পেল।
বহু কষ্টে সে কান্না চাপল।
ছিটকিনি খুলে ঘরের বাইরে গেল। নাজিবের মা রান্না করছেন। তাকে দেখে বললেন "মাথায় কাপড় দাও মেয়ে, তুমি এখন এই বাড়ির মেয়ে"।
মিনি নাজিবের মার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল। বলল "আমার বাবার সঙ্গে কথা বলান"।

নাজিবের মা বললেন "নাজিব আসুক। এলে ফোন করতে বলব"।
মিনি কয়েক সেকেন্ড নাজিবের মার দিকে তাকিয়ে বলল "দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। আমার জেঠু আমার সঙ্গে নাজিবের বিয়ে ঠিক করেছে কী না, সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ নেই। আমি শুধু একটা কথা জানি। এই বিয়েটা আমার নিজের ইচ্ছায় হয় নি। আর আপনারা আমাকে চেনেন না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আপনাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব করে তুলব"।
নাজিবের মা মিনির কথার উত্তর দিলেন না। মন দিয়ে রান্না করতে লাগলেন।

২৮।
ইসলামাবাদে সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছে। দুপুরের মধ্যে জেনারেল নিয়াজি প্রেসিডেন্ট ভবনে ঢুকে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট আলি কাদরীকে হতভম্ব করে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছেন "ঘণ্টা খানেক আছে আপনার কাছে আলি সাহাব। ভবন খালি করে চলে যান"।
আলি কাদরী ঘণ্টাখানেকও নেন নি। মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রেসিডেন্ট ভবন ছেড়ে পালিয়েছেন সেনার গুলির ভয়ে। প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রেস কর্নারে। দেশ বিদেশের নানা সাংবাদিক ভিড় করছেন সেমিনার হলে। নিয়াজি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্য।
এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। নিয়াজি দেখলেন সরফরাজ খান ফোন করছেন। ধরলেন "সালাম সরফরাজ। বল কী বলবে"।
"প্রথমেই কনগ্রাচুলেশন জানাই জনাব"।
"শুক্রিয়া। বহুত শুক্রিয়া"।
"আমার মনে হয় আল্লাহপাক যা করেন পাকিস্তানের ভালোর জন্যই করেন। আজ সকালে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও পাকিস্তানের স্বার্থে আপনার মত শক্তিশালী কাউকেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে দরকার ছিল।"
নিয়াজি একটু থমকে বললেন "জামাল পাশার পরিবারকে আমি সমবেদনা জানিয়েছি সরফরাজ। এছাড়াও জামাল পাশার বিরুদ্ধে যে ভোটে দাঁড়িয়েছিল, সেই সেলিম আহমেদকে জামাল পাশাকে খুন করার অভিযোগে পত্রপাঠ গ্রেফতার করা হয়েছে"।
ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল "জানি জনাব। সব জানি। আমাদের কাজই তো ইনফরমেশন কালেক্ট করা"।

নিয়াজি বললেন "তবে নিশ্চয়ই এও জানো জামাল পাশাকে কে খুন করেছে?"
সরফরাজ হতভম্ব গলায় বললেন "না জনাব। আমি কী করে জানব?"
নিয়াজি বললেন "আমরা করি নি। কেনই বা করতে যাব? আমাদের ক্যান্ডিডেটকে মারতে যাবই বা কেন?"
সরফরাজ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "আমাদের দেখা করা দরকার জনাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব"।
নিয়াজি বললেন "রাতে এসো। দশটার পরে"।
সরফরাজ বললেন "আমেরিকা ফোন করেছিল জনাব?"
নিয়াজি বললেন "ও কমবখতো তো জরুর ফোন করেগা। কাম ক্যা হে উস লোগোকা? দুসরা কান্ট্রিকা হর ম্যাটার মে উনকা ইন্টারেস্ট হ্যায়"।
সরফরাজ বললেন "বি কেয়ারফুল জনাব। ইনশা আল্লাহ রাত্রে দেখা যাচ্ছে"।
নিয়াজি ফোনটা রাখলেন। বেশ খানিকক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখলেন।
আব্বু আম্মির কথা মনে পড়ে গেল। দুজনেই আজ নেই। থাকলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতেন। দেওয়ালে টাঙানো মহম্মদ আলী জিন্নাহর ফটোতে স্যালুট করলেন নিয়াজি। চোখ বন্ধ করে আল্লাহকে স্মরণ করে দরজা খুলে বেরোলেন।
তার সঙ্গে চারজন কম্যান্ডো ছায়ার মত লেগে থাকল। ব্রিগেডিয়ার গুলাম মহম্মদ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিয়াজির পাশে চলতে থাকলেন।
নিয়াজি বললেন "প্রেস কর্নার ভাল করে দেখে নিয়েছ? সিকিউরিটি চেকিং ওকে?"
গুলাম বললেন "ওকে জনাব"।
নিয়াজি বললেন "সেলিম আহমেদ কনফেস করেছে?"
গুলাম বললেন "না জনাব। বরং উল্টোটাই মনে হল। ব্যাপারটা সম্পর্কে ওঁর কোন আইডিয়াই নেই। আরেকটা সমস্যা হল, সেলিম আহমেদকে অকারণে আটকে রাখলে ওঁর সার্পোটাররা বিক্ষোভ করতে পারেন"।
নিয়াজি একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আবার হাঁটিতে শুরু করলেন "টিয়ার শেল চালিয়ে দেবে। দেশের বাকি শহরগুলোতে আর্মি কম্যান্ড নিয়েছে?"
গুলাম বললেন "হ্যাঁ জনাব, নিচ্ছে। অর্ডার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে"।
নিয়াজির মুখে হাসি ফুটল।
দরজা ঠেলে ঢুকলেন কনফারেন্স হলে।
তিনি প্রবেশ করা মাত্র ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে তার চোখ ধাঁধিয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণের গুঞ্জন প্রবল কোলাহলে পরিণত হল। নিয়াজি একটুও না দাঁড়িয়ে

নিজের জন্য নির্ধারিত সিটে বসে কড়া গলায় বললেন "প্লিজ কিপ কোয়ায়েট লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। ফ্ল্যাশ বন্ধ করুন সবার আগে। তারপর কথা"।

মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে শব্দ কমে এল। নিয়াজি বললেন "প্রথমে আমি বলব, তারপর আপনাদের প্রশ্ন শুনব। আমি, এই মুহূর্তে ঘোষণা করছি, আজ, এখন থেকে, আমাদের প্রিয় দেশ পাকিস্তানের দখল নিল পাকিস্তান আর্মি। আজ সকাল বেলায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জামাল পাশার অকাল প্রয়াণ ঘটেছে। দেশের সর্বত্র বিভিন্ন জায়গায় নানা রকম বিশৃঙ্খলার কথা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান আর্মি মনে করেছে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের হাল ধরা তাদের পবিত্র কর্তব্য। যেহেতু অপর প্রার্থী জনাব সেলিম আহমেদকে এই খুনের প্রধান অপরাধী ভাবা হচ্ছে, তাই পাকিস্তান আর্মি মনে করছে, এই মুহূর্তে নির্বাচন করার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবার আগে পর্যন্ত আমি পাকিস্তানের দায়ভার গ্রহণ করছি, ইনশা আল্লাহ"।

সামনে বসা এক বিদেশী সাংবাদিক ঘোষণা করলেন "সেলিম আহমেদ যে জামাল পাশাকে খুন করেছে সেটা পাকিস্তান আর্মি এত তাড়াতাড়ি কীভাবে ইনভেস্টিগেট করল স্যার? অ্যাজ পার রিপোর্ট, অ্যাসেম্বলি রোডের ওই এরিয়াটাতে কোন সিসিটিভি ইনস্টলড ছিল না"।

নিয়াজি সাংবাদিকের দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে বললেন "দ্য ম্যাটার ইজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। এই বিষয়ে এখনই আমি কিছু বলতে পারব না। নেক্সট কোয়েশ্চেন প্লিজ"।

এক মহিলা সাংবাদিক বলতে উঠলেন "স্যার, আজকের ঘটনার ফলে গোটা বিশ্ব কি আবার পাকিস্তানের ডেমোক্রেসি নিয়ে হাসাহাসি করবে না?"

নিয়াজি বললেন "পাকিস্তান আর্মি জানে তাদের ডিউটি আসলে পাকিস্তানে ডেমোক্রাসি যথাসাধ্য বজায় রাখা। আমি নিজেকে ডেমোক্রেসির কেয়ার টেকার বলে মনে করি। এর বেশি কিছু না"।

একজন উঠে দাঁড়ালেন "স্যার, কাশ্মীর নিয়ে আমাদের স্ট্যান্ড কী হবে এই মুহূর্তে?"

নিয়াজি বললেন "দেখুন, কাশ্মীরিদের ইন্ডিয়ান আর্মি খুবই কষ্টে রেখেছে। আমরা কাশ্মীরিদের হিউম্যান রাইটস নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে যথাসাধ্য বলব"।

বিদেশি সাংবাদিক বললেন "আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশনস জানিয়েছেন স্যার? চীন বা ইন্ডিয়া থেকে কোন মেসেজ এসেছে?"

নিয়াজি ঠান্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন "জানাবেন। নিশ্চয়ই জানাবেন। আই থিংক আই ওয়ান্ট লিভ নাও"।
নিয়াজি উঠলেন।
চতুর্দিক থেকে ভেসে আসা কোন প্রশ্নেরই উত্তর না দিয়ে সেমিনার রুম ত্যাগ করলেন।

২৯।
পাবলিক বাসে রাওয়াল পিন্ডি যেতে যেতেই সায়ক জানলা দিয়ে দেখতে পেল রাস্তায় সেনা টহল দিচ্ছে।
দেশে সেনা নেমেছে না কী হয়েছে তাতে বাসের যাত্রীদের বিশেষ কিছু যায় আসছে না। একটা বড় পরিবার উঠেছে। ছোট বাচ্চাটা জোরে জোরে কাঁদছে কেবল। মা সেটাকে একবার থাবড়াচ্ছে তো আরেকজন চিৎকার জুড়ে দিচ্ছে। বাস জুড়ে বাচ্চাদের চিৎকারের শব্দ। আব্বাস বিরক্ত গলায় বাচ্চার বাবাকে বলল "কী মিয়াঁ, বাচ্চাদেরকে একটু সামলাতে পারেন তো। সবই তো বিবিজিকে দিয়ে দিয়েছেন?"
বাচ্চার বাবা হেসে জবাব দিল "আমার কাছে এলে আরও কাঁদবে মিয়াঁ। কী যে বলেন। কোথায় যাচ্ছেন আপনি?"
আব্বাস বলল "রাওয়ালপিন্ডির বাস তো রাওয়ালপিন্ডিই যাবে না মিয়াঁ? পেশোয়ার তো যাবে না"।
বাচ্চার বাবা বলল "তা ঠিক। আমিও রাওয়ালপিন্ডিই যাচ্ছি। এই বিবিজির ভাইয়ের বাড়ি। বিরাট বড়লোক ওরা। এই বড় বড় গাড়ি আছে। আমরা তো গরীব আদমি। কিছুই নেই"।
আব্বাস বলল "তা আপনি গরীব আদমি বড়লোক শ্বশুরবাড়ি পেলেন কী করে?"
বাচ্চার বাবা বলল "সবই আল্লাহর মেহেরবানি। আমি তো গরীব আদমি"।
আব্বাস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সায়ক আব্বাসকে চিমটি কেটে ফিসফিস করে বলল "এত বাচাল হচ্ছ কেন?"
আব্বাস বলল "এমনি। টেনশন লাগছে খুব"।
সায়ক বলল "এত কথা বললে তো টেনশন কমবে না। চুপচাপ বসে থাকো"।
রাওয়ালপিন্ডি ঢোকার মুখে বিরাট জ্যাম। আব্বাস জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে বলল "হয়ে গেল"।
সায়ক অবাক হয়ে বলল "কী হয়েছে?"

আব্বাস বলল "বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সেলিম আহমেদের লোক বোধ হয়"।

সায়ক বলল "বসে থাকো। বাস থেকে নেমো না। ওরা আর্মির সঙ্গে পেরে উঠতে পারবে না"।

বলা মাত্রই আব্বাস দেখতে পেল আর্মি টিয়ার গ্যাস ছুড়তে শুরু করেছে, তার সঙ্গে শুরু হয়েছে লাঠি চার্জ। জনতা মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

আর্মি রাস্তা ফাঁকা করে দিয়েছে। তাদের বাস স্টার্ট দিল।

আব্বাস জোরে বলল "পাকিস্তান আর্মি জিন্দাবাদ"।

বাচ্চার বাবাও চেঁচিয়ে উঠল "জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। তা মিয়াঁ আপনি আর্মিদের পছন্দ করেন?"

আব্বাস বলল "নিশ্চয়ই। আর্মিই তো সব মিয়াঁ। দেশের জন্য বর্ডারে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা, কত ভাল বলত?"

বাচ্চার বাবা বলল "তা ভাল। তবে ওরা যখনই ক্ষমতায় আসে, আমাদের মত আম আদমিদের জিনা হারাম হয়ে যায়। যখন তখন রাস্তায় ধরে চড় চাপড় মেরে দেয়। গরীবদের মিয়াঁ বড় সমস্যা হয় আর্মি এলে"।

আব্বাস বলল "ধীরে বল মিয়াঁ। বাকিরা শুনতে পাবে"।

বাচ্চার বাবা বলল "আর মিয়াঁ, ভয় কাকে? কাউকে ভয় পাই না আমি। কী হবে ভয় পেয়ে? এই আর্মি থাকলেই পাকিস্তানে সব থেকে বেশি কোরাপশন হয়, জানো না সেটা?"

সায়ক আবার আব্বাসকে চিমটি কাটল। আব্বাস কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

বাস শহরে ঢুকে মেইন স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সায়ক আব্বাসকে নিয়ে বাস থেকে নেমে বড় রাস্তা বরাবর হাঁটা শুরু করল।

আব্বাস সায়কের পেছনে দৌড়চ্ছিল "কী হল মিয়াঁ, তোমার আবার কী হল? আমাদের ডেরায় যাবে না?"

সায়ক বলল "না। আমরা পেশোয়ার যাচ্ছি"।

আব্বাস অবাক হয়ে বলল "মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার? পেশোয়ার যেতে হলে তো ইসলামাবাদ থেকেই গেলে হত। আবার রাওয়ালপিন্ডিতে আসার কী দরকার ছিল?"

সায়ক বলল "স্টেশনে চল বেশি কথা না বলে"।

আব্বাস বিরক্ত গলায় বলল "কী যে কর কিছুই বুঝি না"।

সায়ক কোন কথা বলল না। অটো স্ট্যান্ড থেকে একটা অটোতে করে রাওয়ালপিন্ডি স্টেশনে পৌঁছল তারা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল দেড় ঘন্টা পরেই রাতের ট্রেন ছাড়বে। টিকেট কেটে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসল তারা।
আব্বাস বলল "আচ্ছা ত্রাতিয়া সাবকে বলবে না?"
সায়ক বলল "বলব। পেশোয়ার পৌঁছে বলব"।
স্টেশনে সাধারন মানুষেরা প্রতীক্ষা করছে ট্রেনের। ভারতের আর পাঁচটা স্টেশনে যেভাবে প্রতীক্ষা করে সেভাবেই। মাটিতে চাদর পেতে বসে কেউ আড্ডা মারছে। বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে। মহিলারা টিফিন বের করে সবাইকে ভাগ বাটোয়ারা করে দিচ্ছে।
সায়ক অনেকক্ষণ চারদিক দেখে বিড় বিড় করে বলল "কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান "...

৩০।
ডাল লেকের পাশ দিয়ে তাদের গাড়ি যাচ্ছিল। রেহান বললেন "শিকারা চড়েছ?"
বীরেন মাথা নাড়ল "নাহ। কোন দিন চড়া হয় নি। ইচ্ছে আছে। আচ্ছা এখানে ক'টা হাউজবোট আছে?"
রেহান বললেন "মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বলতে পারবে। আমি পারব না। একটা সময় ছিল, যখন এই হাউজবোটগুলোতে সিজনে থাকার জায়গা পাওয়া যেত না। কাশ্মীরের একেক সময় একেক রকম সৌন্দর্য। বসন্তে একরকম, শরতে আরেক রকম। আর শীতকালটা তো বলাই বাহুল্য, বুঝতেই পারছ এই সমস্ত চত্বর যখন বরফে ঘিরে যায় তখন কেমন লাগতে পারে"।
রেহানের ড্রাইভার আনোয়ার বলল "স্যার শ্রীনগর তো কিছুই না। আপনাকে আমি আমার গ্রামে নিয়ে যাব। পহেলগাঁওয়ের কাছে। শ্রীনগর তো নোংরা হয়ে গেছে। ডাল লেকে মানুষ যায় নাকি, ছিঃ"।
রেহান হাসলেন "তা ঠিক। তবে মুঘল গার্ডেন এখনও ভাল করে মেইন্টেইন করা হয়। তুমি গেলে বলবে, আনোয়ার নিয়ে যাবে"।
বীরেন বলল "না না স্যার, আগে আপনি স্যার ঠিক হয়ে যান, তারপর না হয়..."
রেহান বললেন "তোমাকে একজনের গল্প বলি বীরেন। এক ফোঁটাও বানিয়ে বলছি না। তিন বছর আগের কথা। শ্রীনগরে হিজবুলের এক চাঁই ঢুকেছে আমাদের কাছে খবর এসেছে। আবছা নিউজ। ডিটেলস কিছুই জানি না। আমার

এক কলিগ আমার বাড়িতে এসে উঠেছে। আমরা টেনশনে মরছি অথচ তার কিন্তু কোন চিন্তা নেই। দিব্যি আমার পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে, আমার বাইক নিয়ে শহর চক্কর কাটতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার ভীষণ রাগ হল। তখনও ওর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হয় নি। একদিন খুব ঝাড়লাম। ডেকে বললাম শোন মিয়াঁ এ তোমার শহর না, এটা কাশ্মীর। এখানে কখন খরচ হয়ে যাবে নিজেও জানো না। সে ব্যাটা শুধু মিটিমিটি হাসে। একদিন রাতে হঠাৎ করে আমাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে বলল চল। আমি তো অবাক, কোথায় যাব? সে ব্যাটা নাছোড়। ফোর্স টোর্স কখন ডেকেছে জানি না। ঘুম থেকে উঠে দেখি বাড়ির সামনে ফুল ব্যাটেলিয়ান হাজির। আমাকে না জানিয়ে নিজেই সব অ্যারেঞ্জ করেছে। আমার খুব ইগো হার্ট হল। রেগে বললাম ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি কাশ্মীরের চার্জে আছি আর তুমি সার্চ অপারেশন অর্ডার দিয়ে দিলে। আবার কিছু বলে না। শুধু হাসে। বললে বিশ্বাস করবে না বীরেন, লালচকের একটা বাড়ি থেকে সে রাতে হিজবুলের একটা না, তিন তিনটে মাথাকে ধরেছিলাম আমরা। সে স্কাড নো আইডিয়া। ভাবতেই পারে নি আমরা যেতে পারি। এত ক্লিনিক্যাল ফিনিশ ছিল। আমরা যখন ভেবেছি ব্যাটা আরামে শহর ঘুরছে, মজা মারছে, আসলে সে নেটওয়ার্ক রেডি করছিল। নিজের আলাদা সোর্স তৈরী করছিল। যেটুকু সোর্স রিসার্চ ওয়ার্কের ক্লু দিয়ে পেয়েছিল সেগুলোকে আরও বেশি করে যাচাই করেছিল। আশা করছি বুঝেছ কার কথা বলছি।"

বীরেন বলল "খান স্যার?"

রেহান মাথা নাড়লেন "না। সায়ক"।

বীরেন বলল "ওহ। ওঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না আমি। শুধু জানি ওঁর মানিব্যাগটা না পেলে আজকে এই চাকরি করাটাই হয়ে উঠত না আমার"।

রেহান বললেন "সায়কের সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই জানবে তুমি। কিন্তু সায়কের গল্পটা তোমাকে কেন শোনালাম জানো? তোমাকে বুঝতে হবে আমাদের চাকরিতে সবার আগে যেটা দরকার, তুমি যে জায়গাতেই থাকো না কেন, সে জায়গাটাকে হাতের তালুর মত চিনে নিতে হবে। সেটা যদি তুমি না করতে পারো তাহলে..."

একটা বাইক প্রচণ্ড জোরে পিছন থেকে আসছিল। রেহানের নিরাপত্তারক্ষী তারেক রেহানকে বলল "স্যার..."

রেহান ঠাণ্ডা গলায় বললেন "সামনের আর্মি ক্যাম্পে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দাও। সেম বাইক হসপিটালের বাইরে দেখেছি আমি"।

আনোয়ার খানিকটা এগিয়ে আর্মি চত্বরে গাড়িটা পার্ক করে দিল। বাইকটা প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে গেল।
রেহান বললেন "পালিয়ে যাবে কোথায়? নাম্বার নোট করে নিয়েছি"।
রেহানের গাড়ি চিনতে পেরে ক্যাম্প প্রহরারত একদল জওয়ান এগিয়ে এসে বললেন "এনি প্রবলেম স্যার?"
রেহান গাড়ি থেকে নেমে জওয়ানদের বাইক সম্পর্কিত কথাগুলো বলে গাড়িতে উঠলেন।
এতক্ষণ রেহানের যে খোশমেজাজ ছিল তা অনেকটাই অন্তর্হিত। পরিবর্তে বিরক্তি মিশ্রিত একটা কঠিন মুখ করে বললেন "এদের জন্য একবার ঘর ছেড়ে অন্যত্র থাকতে বাধ্য হয়েছি। এবার কি এদের ভয়ে শহরও ছাড়তে হবে?"

৩১।
রাত সাড়ে নটা।
প্রেসিডেন্ট ভবনের বিরাট বেড রুমে জেনারেল নিয়াজি একা বসেছিলেন।
সন্ধ্যে থেকে বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক ফোন এসে গেছে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিয়াজিকে অভিবাদন জানিয়ে বলেছেন পাকিস্তানে যে খুব শিগগিরি গণতন্ত্র ফিরতে চলেছে নিয়াজির নেতৃত্বে সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। নিয়াজি প্রত্যুত্তরে আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে ইসলামাবাদে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন ইচ্ছা করলে নিজে এসেই দেখে যেতে পারেন, এখানকার মত গণতন্ত্র পৃথিবীর অনেক শহরেই নেই। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ঠাট্টা করে বলেছেন তার নিজের যাওয়ার দরকার নেই। পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় একটা কাক বসলে, কোথায় বসল সেটা কাক জানার আগে তিনি জেনে যান। নিয়াজি বেশি কথা বাড়ান নি এর পরে।
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ফোন করে বলে দিয়েছেন আমেরিকার থেকে তারা অনেক বেশি অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বানাচ্ছেন। কেনার আগে যেন তার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া হয়। চিনের প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন তারা সবরকমভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষায় আগ্রহী। পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে ইন্ডিয়াকে ব্যস্ত রাখলে তাদের উত্তর পূর্ব ভারতে চলাফেরা করতে সুবিধা হয়। সৌদি সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের অভিনন্দন এসে পৌঁছেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফোন করে জানিয়েছেন নিয়াজি ক্ষমতায় আসায় তারা অত্যন্ত খুশি, তিনি ভাবছিলেন পাকিস্তান যাওয়ার কথা কিন্তু পাকিস্তানের নির্বাচনের জন্য যেতে পারছিলেন না।

ঠিক করেছিলেন নির্বাচন শেষ হলেই যাবেন। এখন যেহেতু নির্বাচনের কোন ঝামেলা নেই সুতরাং যাওয়া যেতেই পারে। নিয়াজি কূটনীতির শর্ত মেনে সবার সঙ্গেই ভাল করে কথা বলছেন।

শেষ মেশ বিরক্ত হয়ে স্কচের একটা বড় পেগ নিয়ে বসেছেন। দরজায় কেউ একজন নক করল। নিয়াজি বললেন "কাম ইন"।

একজন নিরাপত্তারক্ষী দরজা খুলে বলল "জনাব সরফরাজ এসেছেন জেনারেল"।

নিয়াজি বললেন "এই ঘরে পাঠিয়ে দাও"।

নিরাপত্তারক্ষী বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

নিয়াজি বললেন "হ্যাঁ, এখানেই পাঠাও। নো প্রবলেম"।

মিনিট পাঁচেক পরে সরফরাজ খান এলেন।

মুগ্ধ গলায় ঘরটা বললেন "অনেক শুক্রিয়া জনাব, এই হাউজের বেডরুমে যে, কোনোদিন আসতে পারব, ভাবতে পারিনি কোন দিন"।

নিয়াজি তেতো গলায় বললেন "আই এস আই চিফের গলায় এসব কথা মানায় না সরফরাজ। যে কোন দিন তুমি আমাকে মেরে এই ঘরে চলে আসতে পারো। হু নোজ?"

সরফরাজ বললেন "এ কেমন কথা জনাব? আমাকে কি কোন দিন আপনার কোন অমর্যাদা করতে দেখেছেন?"

নিয়াজি বললেন "পাকিস্তানে সব সম্ভব সরফরাজ। শুধু পাকিস্তানে কেন, এশিয়া আফ্রিকার এই মুসলিম কান্ট্রিতে এভ্রিথিং ইজ পসিবল। এরা ডেমোক্রেসি কাকে বলে শেখেনি। ডু ইউ নো অ্যাবাউট মুজিবুর রহমান? কে মেরেছিল জানো মুজিবুরকে?"

সরফরাজ হাসতে হাসতে বললেন "আপনার সঙ্গে কথায় পারব না জনাব"।

নিয়াজি বললেন "কাজের কথায় এসো সরফরাজ। জামাল পাশাকে কে মেরেছে? কোন ইনফরমেশন পেয়েছ?"

সরফরাজ মাথা নিচু করল "না। কিছুই পেলাম না এখনও। স্টিল নো ক্লু"।

নিয়াজি খানিকটা স্কচ গলায় ঢেলে সরফরাজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন "তুমি অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছ না সরফরাজ?"

সরফরাজ বললেন "জি জনাব"।

নিয়াজি বললেন "ওখানে ড্রামা ক্লাস টাস করেছ?"

সরফরাজ মাথা তুলে নিয়াজির দিকে তাকালেন "কেন বলুন তো?"

নিয়াজি বললেন "এখন থেকে ঠিক চব্বিশ ঘন্টা আগে আমার ক্যান্টনমেন্টের রুমে বসে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না আজ কী ঘটতে চলেছে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে আমাকে অনেকগুলো ডিসিশন নিতে হল। এখন আমি এই রুমে। কিছু কোয়ালিটি নিশ্চয়ই আছে আমার মধ্যে, নইলে কী করে এতদূর এলাম?"
সরফরাজ হাসতে চেষ্টা করলেন "এ কী বলছেন স্যার, এ নিয়ে কোন দ্বিমত আছে নাকি?"
নিয়াজি বললেন "তাহলে আমার কেন মনে হচ্ছে তুমি জামাল পাশার ব্যাপারে আমাকে মিথ্যে কথা বলছ?"
সরফরাজ উত্তর দিলেন না।
নিয়াজি স্থির চোখে সরফরাজের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

৩২।

রাতের ট্রেন চলেছে পেশোয়ারের দিকে। আব্বাস আর সায়ক জেনারেল কামরায় উঠেছে। কামরা ভর্তি গরিব মুটে মজুর। অনেকে মাটিতেও বসে আছেন।
বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। আব্বাস জানলা বন্ধ করে দিয়ে বলল "দেশের বাইরে আছি মনে হচ্ছে না ভাই"।
সায়ক চোখ বন্ধ করে বসে ছিল। বলল "পাকিস্তানে আমার কখনোই সেটা মনে হয় না"।
আব্বাস গলা নামিয়ে বলল "হু, যতক্ষণ না ওদের সঙ্গে তোমার মোলাকাত হয়"।
এক বুড়ো পাঠান শুকনো রুটি চিবাচ্ছিল। আব্বাস করুণ মুখে বলল "কোথায় এখন রাওয়ালপিন্ডির কাবাব খেতাম, ধরে নিয়ে চলে এলে ট্রেনে"!
সায়ক বলল "দুটোর সময় পেশোয়ার পৌঁছে যাব তো। ফারুক চাচার আড্ডার তন্দুরি কাবাব খাওয়াব। চিন্তা করছ কেন?"
আব্বাস অবাক হয়ে বলল "পেশোয়ারেও ব্রাঞ্চ খুলে রেখেছ তুমি?"
সায়ক বলল "তুমিও খোল। কে বারণ করেছে? রাঘব ভাটিয়ার জ্বালা হয়ে থাকলে উন্নতি হবে না জীবনে। তোমার কত ভাগ্য জানো তুমি এই দেশে আসার সুযোগ পেয়েছ? কটা ইন্ডিয়ান এই সুযোগ পায়? বালুচিস্তান যাও নি, মহেঞ্জোদারো যাও নি, করাচী বেকারির কেক খাও নি..."
আব্বাস বিড় বিড় করে বলল "টেরোরিস্টের গুলি খাও নি... বলে যাও। বলে যাও..."

সায়ক সিটে হেলান দিয়ে বসে বলল "ওয়ান্স আপন এ টাইম, গোটাটাই ভারতবর্ষ ছিল আব্বাস। তুমি মুজতবা আলী পড় নি, তোমাকে আর কী বোঝাব?"
আব্বাস রেগে গিয়ে বলল "সব সময় পড়ার খোঁটা দেবে না সায়ক, আমি বাংলা জানি না, কী করে পড়ব তোমাদের বাঙালি রাইটারদের বই?"
সায়ক বলল "তা ঠিক। রবীন্দ্রনাথই পড় নি, বেঁচে থেকে কী করবে?"
আব্বাস গোমড়া মুখে বলল "ট্রান্সলেশন পড়েছি"।
সায়ক বলল "রবীন্দ্রনাথ ট্রান্সলেশনে পড়া আর মাংস ছাড়া বিরিয়ানি খাওয়া একই ব্যাপার বুঝলে হে আব্বাস। জীবনে কী করলে তুমি? না ইসলামাবাদে বসে বসে শুধু জাসুসি করে গেলে"।
আব্বাস বলল "আমি জাসুসি করেই খুশি। আমার অত ক্ষুরে কাজ নেই"।
সায়ক বিদ্রুপের সুরে বলল "তা তুমি ভালই কর। টেররিস্টের ভয়ে খাটের তলায় শুয়ে থেকো এর পরে"।
ট্রেনটা একটা হল্ট স্টেশনে দাঁড়াল। বেশ কয়েকজন সেনা কামরায় উঠে টহল দিয়ে নেমে গেল। খানিকক্ষণ পরে ট্রেন ছাড়ল। আব্বাস শ্বাস রোধ করে বসে ছিল। ট্রেন ছাড়লে বলল "কী ব্যাপার বল তো? এত চাপ কীসের?"
সায়ক একটা হাই তুলল "দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, এতো রোজকার নৌটঙ্কি। ইসলামাবাদে এতটা আঁচ পাবে না, যতটা দেশের অন্যত্র পাবে। করাচীতে দেখো এতক্ষণে ক'টা লাশ পড়ে গেল"।
আব্বাস বলল "আজব দেশ বটে একটা হ্যাঁ? নিজেরাই নিজেদের মারছে, আজ এখানে ব্লাস্ট করছে, কাল সেখান ব্লাস্ট করছে, আবার শখ কম না। শালাদের কাশ্মীর চাই, হুহ"।
সায়ক বলল "শখই বটে। যার বীজ পুঁতে দেওয়া পলিটিশিয়ানদের। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যে বিদ্বেষের গাছ বেড়ে চলেছে দুই দেশের মানুষের মনে"।
আব্বাস বলল "একটু আস্তে বস। লোকে শুনলে চাপ আছে"।
সায়ক চোখ বুজল।
ট্রেন পনেরো মিনিট লেট করল পেশোয়ার পৌঁছতে।
আব্বাস ঘুমিয়ে পড়েছিল। সায়ক আব্বাসকে ঠেলে তুলল। আব্বাস হাই তুলতে তুলতে বলল "উফ, শান্তি নেই জীবনে। কী করতে যে এই চাকরিতে ঢুকেছিলাম"।
সায়ক বলল "চল চুপচাপ। কথা বোল না"।

স্টেশন পাকিস্তানি আর্মিতে ভর্তি। দুজনে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে স্টেশনের বাইরে গেল।

সায়ক কোন দিকে না তাকিয়ে রাস্তা বরাবর হাঁটতে শুরু করল।

আব্বাস পিছনে পিছনে দৌড়তে দৌড়তে বলল "ও মির্যা, কোথায় যাচ্ছ?"

সায়ক বলল "চুপচাপ চল"।

বেশ খানিকটা দূরে একটা অটো দাঁড়িয়ে ছিল। সায়ক সেটায় উঠে পড়ল।

আব্বাস অবাক চোখে বলল "কী হল?"

সায়ক বলল "উঠে পড়"।

অটোওয়ালা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করেই অটো স্টার্ট করল।

আব্বাস ফিসফিস করে বলল "কী হচ্ছে? একে চেনো? কোথায় যাচ্ছি এত রাতে?"

সায়ক হেসে বলল "ফারুক চাচার তন্দুরি কাবাব! ভুলে গেলে?"

৩৩।

ফারুক কাবাব সেন্টার পেশোয়ার বাজারের এক তস্য গলির ভেতরে। লোক জন না থাকলেও ফারুক শিক কাবাব তৈরী করছিলেন মন দিয়ে।

আব্বাসকে নিয়ে সায়ক যখন পৌঁছল তখন রাত তিনটে বাজে। ফারুক সায়ককে দেখে হাসলেন, বললেন "এতদিন পরে মনে পড়ল চাচাকে? তাও এত রাতে?"

সায়কও প্রত্যুত্তরে হাসল, বলল "চাচা, আব্বা, আম্মি এদের তো দরকারের সময়ই মনে পড়ে চাচা। মনে তো ভরসা ঠিকই থাকে যে তোমরা আছো আমার পিছনে। নইলে বেঁচে থাকতাম কী করে বল?"

ফারুক বললেন "হয়েছে হয়েছে মির্যা। অনেক ঘি দিয়েছ রান্নায়, এবার কী খাবে বল"।

সায়ক বলল "দাওয়াত এ ইশক লাগিয়ে দাও চাচা"।

আব্বাস অবাক চোখে সায়কের দিকে তাকাল।

ফারুক হাসলেন না। বললেন "ভিতরে যাও। আমি আসছি"।

দোকানের মধ্যে একটা দরজায় পর্দা লাগানো। সায়ক আব্বাসকে বলল "এসো"।

দরজা খুলে খানিকটা এগিয়েই একটা কাঠের সিঁড়ি পাওয়া গেল। সায়ক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। নিচে আকাশ অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। সায়ক ধমক দিল "কী হল, এসো শিগগিরি"।

দোতলায় একটা ছোট ঘর। সেখানে কম্পিউটার থেকে শুরু করে সব আছে। আকাশ সেটা দেখে চোখ বড় বড় করে বলল "ইয়াল্লা!!! এ কী!!! এতো পুরো সাইবার সেল খুলে রেখে দিয়েছে মিয়াঁ"।

সায়ক বলল "তুমি বস। বিশ্রাম কর। কাবাব আসছে"।

সায়ক কম্পিউটারে বসল। কিছুক্ষণ কাজ করে সিকিওর লাইনে তুষারকে ফোন করল।

একবার পুরো রিং হয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার রিং হতেই তুষার ঘুম ঘোরে বললেন "হু"।

"সিকিওর লাইন স্যার। কথা বলা যাবে"।

"ওহ। কোথায় পেলে সিকিওর লাইন?"

"পেশোয়ারে এসেছি। রাঘব ভাটিয়া ইসলামাবাদে অ্যারেঞ্জ করতে পারছিলেন না"।

"মাই গড! পেশোয়ার! সে তো আরও ডেঞ্জারাস জায়গা"।

"চিন্তা করবেন না স্যার। আমি তো মরেই গেছিলাম। ধরে নিন এখন বোনাস সার্ভিস দিচ্ছি। আপনি কোথায় আছেন এখন?"

"কলকাতায়। হাসান মাকসুদকে জামাই আদর করা হচ্ছে। নিজের ভাইঝিকেই কিডন্যাপ করিয়েছে জানোয়ারটা"।

সায়ক হাসল "এসব তো এদের কাছে জলভাত। নিজের দু দিনের বাচ্চাকে যারা সুইসাইড বোমার হিসেবে ইউজ করতে পারে তারা সব পারে। কোথায় রেখেছে কিছু ট্রেস করতে পেরেছেন?"

"বাংলাদেশে। আচ্ছা লিভ ইট। আমি এসব দেখছি। তুমি তোমার আপডেট দাও"।

"আজ সকালে জামাল পাশাকে কিডন্যাপ করতে গেছিলাম"।

"শিট! তোমরা মেরেছ?"

"না না। শুনুন আগে পুরোটা"।

"বল। উফ! ঘাম ঝরিয়ে দিলে কথাটা বলে"।

"আমরা টার্গেট ফিক্স করে এগোচ্ছিলাম সেই সময়েই মার্ডারটা হয়"।

ওপাশটা খানিকটা নীরবতা। তারপর তুষার বললেন "কারা ছিল? পাকিস্তানি আর্মি?"

"না"।

"তবে?"

"রেকগনাইজ করা যায় নি স্যার। আমার ধারণা পাকিস্তান আর্মিও এদের খুঁজছে"।

"দিস ইজ ভেরি ডিস্টারবিং সায়ক। এদিকে খানের ওপরেও একটা মার্ডার অ্যাটেম্পট হয়েছিল। কোন মতে বেঁচে গেছে। কবে ফিট হবে ঈশ্বর জানেন। শ্রীনগর ভীষণভাবে ডিস্টার্বড। হাসান মাকসুদ তার অস্তিত্বের ভেতর কী লুকিয়ে রেখেছে গড নোজ"।

"সামথিং ভেরি ডেঞ্জারাস ইজ কুকিং স্যার। হাসান মাকসুদ মে বি দ্য কি পার্সন"।

"হুহ। কিছু বলছে না অাউট্রেলটা। যত রকম ভাবে সম্ভব জেরা করা হয়েছে। নো ক্লু। যাক, তোমার প্ল্যান বল"।

"স্টিল নো প্ল্যান স্যার। ট্রায়িং টু কালেক্ট ইনফরমেশন"।

"পেশোয়ারে থাকবে ক'দিন?"

"ঠিক নেই স্যার। সব ফারুক চাচার কৃপা"।

"থাও থাও। জিন্দেগী মুবারক হো সায়ক"।

"থ্যাঙ্কস স্যার। জয় হিন্দ"।

"জয় হিন্দ"।

ফোনটা রাখল সায়ক। আব্বাস চোখ বড় বড় করে তার কথা শুনছিল। এবার হায়দ্রাবাদি হিন্দিতে যে কথাটা বলল তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় পাগল করে দে মা কাগজ কুড়িয়ে খাই।

দরজা ঠেলে ঢুকলেন ফারুক। বললেন "খাও, টেংরি কাবাব আর বাখরখানি দিয়ে খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর ভাতিজারা"।

একটাই থালা। মেঝেতে তিনজনে গোল হয়ে বসল। সায়ক বলল "চাচা, আপডেট দাও চাচা। আপডেট চাই"।

ফারুক বললেন "আপডেট বলতে অনন্তনাগে আমার ভাতিজার মেয়ে হয়েছে। বোনঝি পড়াশুনা করতে দিল্লি ইউনিভার্সিটি গেছে। আমার বউ এখনও ভাবে তার স্বামী বাড়ি ফিরে আসবেই একদিন। বাড়ির সামনে যে চিনার গাছটাকে দেখে এসেছিলাম সেটা অনেক বড় হয়ে গেছে"।

আব্বাস বলল "আপনি কাশ্মীরি?"

ফারুক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোকালেন, "আমি যে আসলে কী, তা নিজেই জানি না। আমার পাশের দোকানের ছেলেরা আমায় নিজের বাবার মত দেখে। এই বস্তির দোকানদারেরা আমাকে গুরুর মত মনে করে। আমার কথাতেই সবাই ওঠে বসে। প্রতিটা মানুষের বিপদে আপদে আমিই সবার আগে হাসপাতালে ছুটে যাই। হিন্দুস্তানী হয়ে পাকিস্তানের মানুষের জন্য জান কবুল করি। আমি কী, তোমরাই বল?"

সায়ক হাসল "আপনি একজন প্রকৃত মানুষ ফারুকচাচা"।

ফারুক বললেন "ছাড়ো এসব কথা। তুমি যে খবরটা শুনতে চেয়েছিলে সেটা শোন। সরফরাজ খান পেশোয়ারে এসেছিল দিন দুয়েক আগে"।

সায়ক মুরগীর ঠ্যাঙে একটা জবরদস্ত কামড় দিয়ে বলল "কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ। শানদার, জবরদস্ত, জিন্দাবাদ"।

৩৪।

মিনি গোঁজ হয়ে বসেছিল বেডরুমে। নাজিবের মা কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন "খেয়ে যাও"।

মিনি না করল না। তার খিদে পেয়েছিল। খাওয়ার টেবিলে বসে দেখল ভাত বাড়া হয়েছে।

মিনি হাত ধুয়ে খেতে বসল।

নাজিবের মা চেয়ার নিয়ে তার সামনে বসে বললেন "হাসানভাই এ বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। বর্ডার পেরিয়ে এক রাত থাকতেন"।

মিনি কিছু বলল না চুপচাপ খেতে লাগল।

নাজিবের মা বললেন "হাসানভাই তোমাকে কোনদিন নাজিবের কথা বলেন নি?"

মিনি বলল "না"।

নাজিবের মা বললেন "পেপের ঝোলটা খাও। আমাদের গাছের"।

মিনি বলল "আমি পেপে খাই না"।

নাজিবের মা বললেন "আগে খেতে না। এখন খাবে"।

মিনি নাজিবের মার দিকে তকাল। ভদ্রমহিলার গলার মধ্যে এক অদ্ভুত জোর এসেছে। সে বলল "না খেলে কী করবেন?"

নাজিবের মা বললেন "আমি মাঝে মাঝে ইন্ডিয়া যাই। বর্ডার পেরিয়েই যাই। অনেক জানাশোনা আছে ওপারে। আমাজপাতির দামও কম। একবার বনগাঁয় গিয়ে দেখেছিলাম একটা গোটা পরিবারকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির বউকে তারা পুড়িয়ে মেরেছিল। তোমাদের ইন্ডিয়াতে আইন কানুন আছে। অনেক নিয়ম আছে। কিন্তু এখন তুমি এই দেশে আছো। থানার শাসন অনেক শিথিল। বেপর্দা বেহায়া মেয়েছেলেকে কীভাবে সহবৎ শেখাতে হয়, তা আমাদের গ্রামের মুরুব্বিরাই বলে দেন। তুমি যদি মনে কর, এখানে থেকে তুমি আমাকে, আমার ছেলেকে শাসানি দেবে, রোয়াব দেখাবে, তোমাকে আমি এইটুকু কথা দিতে পারি, গ্রামের মাঝখানে তোমাকে নিয়ে গিয়ে জামা কাপড় খুলিয়ে যদি গ্রামের মুরুব্বিদের দিয়ে তোমাকে আগাপাস্তালা বেত না মেরেছি, তবে আমার নামও মনোয়ারা বেগম না। অনেক ভাল ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। খাও, যা দিয়েছি সব খাও"।

নাজিবের মাকে মিনি শান্তশিষ্ট ভদ্রমহিলা ভেবেছিল, যিনি চুপচাপ থেকে কাজ করে যান। হঠাৎ করে নাজিবের মায়ের এই শাসানিসুলভ কথায় সে খানিকটা অবাক হল। না চাইতেও পেপের ঝোল দিয়ে ভাত মাখল।

মনোয়ারা বেগম বললেন "খেয়ে দেয়ে স্নান করবে। খানকতক কাপড় আছে, সব কেচে রোদে দেবে। তোমাকে পড়াবার জন্য আগেই হাসান সাহেব আমাকে একটা বই দিয়ে গেছিলেন। সেটা পড়বে। এর অন্যথা যেন না হয়"।

কথাগুলো বলে মনোয়ারা চেয়ার থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। মিনির সকালে যে আত্মবিশ্বাসটা এসেছিল তা অনেকটা ধাক্কা খেল। সে বুঝতে পারল নাজিবের মা মোটেও নরম মেয়েমানুষ নন। বরং যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে কাজ করেন। গতকাল কিংবা আজ সকালে তার কথায় কোন রকম সীন ক্রিয়েট করেন নি। মিনিকে খানিকটা বিশ্রামের সুযোগ দিলেন। তারপরে, খাওয়ার টেবিলে দিব্যি নিজের ক্ষমতাটা বুঝিয়ে দিলেন।

ভাত, ডাল, পেপের ঝোল, মাছ সব একসাথে কোনমতে খেয়ে মিনি উঠল। মনোয়ারা বেগম ঘর থেকে বললেন "কল পাড়ে কাপড়, সাবান সব রাখা আছে"। বাড়িতে ঠিকের মাই জামাকাপড় কাচত। মিনিকে করতে হত না। এখানে সে সুযোগ নেই। অনভ্যস্ত হাতে বেশ কিছুক্ষণ কাপড়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে মিনি মিনিট দশেক বাদে রণেভঙ্গ দিল।

মনোয়ারা কল পাড়ে এসে বললেন "কী হল?"
মিনি বলল "আমার অভ্যাস নেই কাপড় কাচার"।
মনোয়ারা বললেন "সব অভ্যেস তো একদিনে হয় না। পুরুষমানুষ গায়ের ওপর উঠবে, সে অভ্যাস ছিল এতদিন? ছিল না তো, এবার হবে। কর, ওভাবেই ধোও, করতে থাকো, ঠিক হবে"।
মিনি স্তম্ভিত হয়ে মনোয়ারার দিকে তাকাল। এরকম কথা যে মহিলা বলতে পারেন সে কল্পনাও করে নি।
মনোয়ারা সেই একই গলায় বললেন "কাল তুমি খুব বেঁচে গেছো। কতদিন বাঁচবে? পাঁচ দিন, ছদিন? মনে রেখো, মেয়ে মানুষের জন্মই হয় পুরুষকে আনন্দ দেবার জন্য। কাল অনেক ক্লান্ত ছিলে বলে তোমাকে আমি কিছু বলি নি। আমাকে রাগিও না তুমি। আমি রাগলে তোমার কোন ধারণা নেই আমি কী করতে পারি"।
মিনি বলল "জেঠুর সামনে আপনি এভাষায় কথা বলেন বুঝি? পুরুষমানুষ গায়ে উঠবে... এভাবেই বলেন?"
মনোয়ারা বললেন "মেয়েমানুষ নিজেদের মধ্যে যে কথা বলে, আর পুরুষমানুষের সঙ্গে যে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ আলাদা। তোমার বাড়িতে এসব সম্পর্কে ভাল শিক্ষা হয় নি তা তোমার চাল চলন দেখেই বুঝতে পেরেছি। বুক তো খোলা মনে হচ্ছে। হাত পড়েছে কতবার? কলকাতায় ছেলে ছোকরা জুটিয়েছিলে বুঝি? কলকাতার মেয়েদের সম্পর্কে তো অনেক কথাই শুনি। পেট বাঁধিয়েছ একবারও?"
মিনি রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল।
মনোয়ারা শান্ত গলায় বললেন "রাগ হচ্ছে? রাগ করে লাভ নেই। আমাদের বাড়ির সামনে নাজিব মোতালেবকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। বেশি অসভ্যতা করবে, তোমার ওই রক্তমাখা জায়গা দিয়েই মোতালেব তোমাকে যা শাস্তি দেওয়ার দেবে। যাও, কাপড় কেচে আমার ঘরে এসো। কথা আছে"।
মনোয়ারা চলে গেলেন।
মিনির জোরে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু সে কিছুই করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

৩৫।

আব্বাস ঘুম থেকে উঠে তীক্ষ্ণ চোখে সায়কের দিকে তাকিয়ে ছিল। সায়ক কম্পিউটারে কাজ করছিল।

আব্বাস বলল "তুমি সারারাত ঘুমাও নি, তাই না?"

সায়ক অন্যমনস্কভাবে বলল "কেন ঘুমাব না? দিব্যি ঘুমিয়েছি"।

আব্বাস রেগে গেল, "হতেই পারে না। আমার যখনই ঘুম ভেঙেছে, তুমি কম্পিউটারে কাজ করছিলে"।

সায়ক বলল "হু"।

আব্বাস বলল "কী হু? আজ কি এখানেই থানা গাড়ার প্ল্যান আছে?"

সায়ক বলল "হু"।

আব্বাস বলল "ধুস! কী হল?"

সায়ক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল "আমেরিকা নিয়াজির সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছে, চীন খুশি। রাশিয়া খুশি। সৌদি খুশি। আর কী চাই?"

আব্বাস বলল "এটা জানার জন্য তুমি সারারাত জেগে বসে আছো?"

সায়ক উঠল, "আমি নিচে গেলাম। তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো"।

আব্বাস লাফিয়ে উঠে বলল "ইয়ার্কি হচ্ছে? সকালের কাজ কর্ম তো করতে দেবে"।

সায়ক ঘড়ি দেখে বলল "সাত মিনিট ম্যাক্সিমাম"।

আব্বাস লাফ ঝাঁপ দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। দশ মিনিট পরে দরজা দিয়ে মাথা বের করে বলল "আর পাঁচ মিনিট দাও প্লিজ, কালকের কাবাব বুঝতেই পারছ, বেরোতে টাইম লাগছে"।

সায়ক বলল "দেরী কোর না"।

দুজনে নিচে নামল আরও মিনিট পাঁচেক পরে। আব্বাস বলল "আমার যদি রাস্তায় আবার পায়, তাহলে কী হবে?"

সায়ক বলল "রাস্তাতেই বসে পড়বে। স্বচ্ছ পাকিস্তান অভিযানের লোকেরা তোমায় ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করবে। আর কী হবে?"

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে দুজনে গলি দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আব্বাস বলল "এবার কোথায় যাব?"

সায়ক বলল "বাজার ঘুরব। বাজার ঘুরতে ভাল লাগে না তোমার?"

আব্বাস বিরক্ত গলায় বলল "সকালবেলা রাস্তায় নামিয়ে মস্করা হচ্ছে মিয়াঁ? আমরা বাজার ঘুরতে বেরিয়েছি"?

সায়ক বলল "আমি তো তোমাকে অপশন দিয়েছিলাম, নাও আসতে পারতে"।
আব্বাস মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল "পাকিস্তানে কখনও একা থাকতে নেই। এটা আমি প্রথম থেকে মেনে চলি। তুমি হারিয়ে গেলে আমার কী হবে?"
সায়ক বলল "কী হবে? চাচা আছে তো"!
আব্বাস কলল "চাচাও যদি হারিয়ে যায়?"
সায়ক হাসল "এ তো সেই গল্পটা মনে পড়িয়ে দিলে"।
আব্বাস ভ্রু কুঁচকাল "কোন গল্পটা"?
সায়ক বলল "সেই যে, একবার ক্লাসে এক স্যার জিজ্ঞেস করেছেন বল তো ছাত্ররা যদি তোমরা জাহাজে করে যাও আর ঝড় উঠে যায়, তাহলে কী করবে?কেউ পারল না। শুধু এক ছাত্র বলল নোঙর ফেলে দেব। স্যার বললেন যদি আবার ঝড় আসে? ছাত্র কলল আবার নোঙর ফেলব। স্যার কললেন যদি আবার ঝড় আসে? ছাত্র কলল আবার নোঙর ফেলব। শেষমেশ স্যার বিরক্ত হয়ে কললেন এত নোঙর পাচ্ছ কোত্থেকে তুমি? ছাত্র বলল যেখান থেকে আপনি এত ঝড় পাচ্ছেন"।
আব্বাস কলল "ভেরি ফানি। সিরিয়াসলি বল না মির্যা কোথায় যাচ্ছি?"
বড় রাস্তার কাছে এসে সায়ক একটা অটোকে বলল 'মিউজিয়াম চল'।
অটো স্টার্ট দিল। আব্বাস ফিসফিস করে কলল "মিউজিয়ামে কী আছে?"
সায়ক বলল "শহর দেখো। এত প্রশ্ন কেন। বল তো ওটা কার মূর্তি?"
আব্বাস চোখ ছোট ছোট করে দেখে কলল "জিন্নাহ?"
সায়ক বলল "একদম ঠিক। ওই কুলফির দোকানটার নাম কী?"
আব্বাস কলল "শান এ পেশোয়ার"।
সায়ক বলল "এই তো। তুমি শহর চিনতে শুরু করেছ"।
আব্বাস গজগজ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অটো মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়াল। সায়ক টাকা মিটিয়ে হাঁটতে শুরু করল।
আব্বাস কলল "ও মির্যা, দেখতে পাচ্ছেন না, মিউজিয়াম তো এদিকে। আপনি উলটো দিকে যাচ্ছেন কেন?"
সায়ক বলল "মিউজিয়াম যাচ্ছি কে কলল তোমায়? আল্লাহই সাম কমন সেন্স মাঙ্গ!"
আব্বাস কলল "ওহ। তা ঠিক ঠিক। কোথায় যাচ্ছি"?
সায়ক চারদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হতে হতে কলল "ভাল আখরোট কিনতে"।
আব্বাস অবাক গলায় বলল "আখরোট? সে তো কাশ্মীরেও পাওয়া যায়"।

সায়ক রাস্তার এপারে এসে একটা গলিতে ঢুকল। রাস্তার দুপাশে কেবল ড্রাই ফ্রুটসের দোকান। পেশোয়ার পুরনো শহর। বেশ কয়েকটা বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। আব্বাস বলল "হেরিটেজ জায়গা সত্যি। বোম মেরে উড়িয়ে দিলেও কারও কিছু যায় আসে না"।

সায়ক বলল "আসে। এখানেও মানুষই থাকে আব্বাস"।

আব্বাস বলল "কীসের মানুষ? রোজই তো লাশ পড়ছে পাঠানদের ঝামেলায়"।

একটা বেশ বড় ড্রাই ফ্রুটসের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সায়ক। আব্বাসকে বলল "দাঁড়াও"।

দোকানের ভিতরে একজন বয়স্ক পাঠান বসে আছেন। সায়ক গিয়ে ভদ্রলোককে ফিসফিস করে কিছু বললেন। ভদ্রলোক উঠে একটা ছেলেকে ডাকল।

আব্বাস দেখতে পেল ছেলেটা সায়ককে কিছু বলছে।

একটু পরে ছেলেটাকে নিয়ে সায়ক দোকান থেকে বেরিয়ে আব্বাসকে বলল "চল"।

আব্বাস অবাক গলায় বলল "কোথায়?"

সায়ক বলল "চল চল"।

আব্বাস বলল "কিছুই বুঝছি না"।

সায়ক বলল "বুঝতে হবে না। চল"।

সায়কের সঙ্গে যে ছেলেটা এসেছিল সে বেশ জোরে হাঁটছিল। সায়ক আর আব্বাসকে প্রায় দৌড়তে হচ্ছিল।

খানিকক্ষণ পর ছেলেটা বড় রাস্তা পার্ক করে রাখা একটা গাড়িতে উঠে দরজা খুলে দিল।

সায়ক বলল "চল"।

আব্বাস বলল "কোথায়?"

সায়ক হাসল "জন্নত"।

৩৬।

রেহানের বাড়িতে প্রচুর খেতে হল বীরেনকে। বাড়ির সামনে প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী দেখে বীরেন অবাক হয়ে রেহানের দিকে তাকিয়েছিল। রেহান হেসে বলেছেন "কী আর করবে বল, নিজভূমেই পরবাসী এখন আমরা। কাশ্মীরে আজকাল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের চাকরি করাটাও গুনাহ"।

লাঞ্চের পর রেহান বীরেনকে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন "বিশ্রাম নাও। সায়ক এলে এখানে এই ঘরেই থাকে। ঘন্টাখানেক পরে তোমাকে হসপিটালে নামিয়ে দিয়ে আমি অফিসে বেরিয়ে যাব"।

বীরেন ঘরটা দেখল। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম একটা ঘর। বইয়ের আলমারিতে প্রচুর বই। একটা বাংলা ভাষায় লেখা গীতাঞ্জলীও দেখতে পাওয়া গেল।

রেহান তাকে জামাকাপড় দিয়েছিলেন, সেগুলো পরে বীরেন আধ ঘন্টা মত চোখ বুজল। বাড়িতে ফোন করে বাবা মার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে আবার তৈরী হয়ে বেরোল।

রেহানও তৈরী হয়ে গেছিলেন, দুজনে বেরোল যখন তখন বিকেল সাড়ে চারটে। রেহান ড্রাইভারকে বললেন "ওকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে আমাকে অফিসে পৌঁছে দিও"।

খানিকক্ষণ পরে গাড়ি বড় রাস্তায় উঠল। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

বীরেনের ফোন বাজছিল। বীরেন দেখল তুষার স্যার ফোন করছেন, ধরল সে "হ্যাঁ স্যার"।

"বীরেন, মাথুরকে জরুরি কাজে রাজস্থান যেতে হয়েছে। আমার আর্মি হসপিটালের ইনচার্জের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। কাল সকালে খানকে নিয়ে তোমাকে দিল্লি আসতে পারবে। চপারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে"।

"ওকে স্যার"।

"আমি রেহানকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেব তোমাকে কী করতে হবে, তুমি চিন্তা কোর না, ও তোমাকে গাইড করে দেবে"।

"হ্যাঁ স্যার। নো প্রবলেম, রেহান স্যারের বাড়িতেই লাঞ্চ করেছি আজ। আমার পাশেই বসে আছেন উনি। কথা বলবেন?"

"ওহ, তা হলে তো খুব ভাল। দাও"।

বীরেন রেহানকে ফোনটা দিল। রেহান কিছুক্ষণ তুষারের সঙ্গে কথা বলে ফোনটা রেখে বললেন "স্যার রিস্ক নিতে চাইছেন না মনে হয় কাশ্মীরে রেখে"।

বীরেন বলল "অন্য কিছুও হতে পারে। দিল্লিতে এইমস আছে, স্যার ওখানেও ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন খান স্যারকে"।

রেহান বললেন "তা ঠিক। তুমি তাহলে কালকে কাশ্মীর ছাড়ছ। আশা করব আবার আমাদের দেখা হবে খুব শিগগিরি"।

বীরেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় তাদের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল। এক ভদ্রলোক বাইকে যাচ্ছিলেন, উল্টোদিক থেকে আসা

একটা গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। ভদ্রলোক ছিটকে পড়লেন রাস্তায়। গাড়িটা দাঁড়াল না ভয়েই হয়ত। স্পিড বেরিয়ে গেল।

আনোয়ার গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। রেহান বললেন "শিট! তারেক অ্যাম্বুলেন্সে ফোন কর জলদি"।

তারেক বলল "স্যার অ্যাম্বুলেন্স আসতে তো সময় লাগবে। আমরা তো হসপিটালেই যাচ্ছি, ভদ্রলোককে গাড়িতে তুলে নিই বরং"।

রেহান একটু ভেবে বললেন "বেশ। তবে আর কাউকে না। ওঁকেই তোল"।

রাস্তায় লোক জমে গেছিল। তারেক বেশ লম্বা চওড়া চেহারার যুবক। ভদ্রলোককে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়িতে বীরেনের পাশে বসালেন। ভদ্রলোক কাতরাচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন "শুক্রিয়া সাব। আল্লাহ আপনাদের ভাল করবে"।

রেহান বললেন "আপনি ঠিক আছেন তো?"

ভদ্রলোক যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে বললেন "পায়ে খুব ব্যথা করছে। আর বাইকটার কী হবে বুঝতে পারছি না। বাড়ি ফিরছিলাম এখন অফিস থেকে"।

রেহান বললেন "বাইকের চিন্তা আপনাকে করতে হবে না, আমি ফোন করে দিচ্ছি"।

রেহান ফোন বের করে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে রাস্তার নাম বলে বাইকের বর্ণনা দিয়ে বললেন বাইকটা আপাতত থানায় নিয়ে গিয়ে রাখতে। পরে ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন।

তারেক ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন "আপনার বাড়ি কোথায়?"

ভদ্রলোক বললেন "মুঘল মহল্লায়"।

তারেক বললেন "সে তো উল্টোদিকে। আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

ভদ্রলোক বললেন "আমার মেয়ে থাকে। ওর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম"।

তারেক বকবক করে যেতে লাগল ভদ্রলোকের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে তাদের গাড়ি আর্মি হসপিটালে পৌঁছল।

রেহান বললেন "আপনি হসপিটালের ভেতরে যান, আপনার ফার্স্ট এইডের জন্য আমি বলে দিচ্ছি। যদিও এখানে সিভিলিয়ানদের চিকিৎসা হয় না, তবু আমি বলে দিচ্ছি, চিন্তা করবেন না"।

ভদ্রলোক বললেন "আপনাকে অনেক শুক্রিয়া সাহাব"।

তারেক ভদ্রলোককে হাসপাতালের আউটডোর অবধি দিয়ে গেল।

রেহান বললেন "আমি এলাম বীরেন, তুমি আশরফের সঙ্গে দেখা করা হয়ে গেলে আমাকে জানিও, আমি আনোয়ারকে পাঠিয়ে দেব। আজ রাতটা আমার অতিথি হয়েই থেকো। গেস্ট হাউজে যেতে হবে না"।

বীরেন আপত্তি করতে যাচ্ছিল, রেহান হাত তুলে বললেন "কোন কথা না। এখানে আমি তোমার বস। ভুলে যেও না"।

বীরেন আর কী বলবে। রেহানের কথার ওপরে কথা বলতে পারল না। কিন্তু রাতেও দুপুরের মত অত খেতে হবে ভেবেই সে ভয় পেয়ে গেল।

আই সি ইউর সামনে পৌঁছতেই একজন সিস্টার এসে বললেন "আপনি বীরেন?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

সিস্টার বললেন "আপনাকে স্যার খুঁজছেন। যান"।

বীরেন তড়িঘড়ি আই সি ইউর ভিতরে গেল। খান স্যার তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন "ভাল তো?"

বীরেন বলল "আপনি বলুন স্যার কেমন আছেন আপনি?"

খান স্যার বললেন "দিব্যি। বেঁচে গেলাম এ যাত্রায়। আল্লাহ তোমাকেই পাঠিয়েছিলেন এবার আমাকে বাঁচাতে"।

বীরেন বলল "আপনি আমাকে খুঁজছিলেন?"

খান চোখ বন্ধ করলেন। তারপর বললেন "হ্যাঁ। শোন বীরেন, এখন যে কথাটা বলছি সেটা কাউকে বলবে না, শুধু তুমি আর আমি জানি। তুষার স্যারের সঙ্গে দেখা হলে তবেই বলব। কেন ব্যাপারটা আমার এখন আর সেফ মনে হচ্ছে না"।

বীরেন বলল "হ্যাঁ স্যার, বলুন"।

খান বললেন "কলকাতা পৌঁছে আমি একটা থ্রেট মেইল পাই। তুষার স্যারকেও বলি নি কথাটা"।

বীরেন বলল "কী ছিল মেইলে?"

খান বললেন "আমি যেন কাশ্মীর না যাই। এখানে নাকি আমার কবর প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি তখন পাত্তা দিই নি ব্যাপারটা। এবারে মনে হচ্ছে পাত্তা না দেওয়াটা ভুল ছিল। আর যারা মেইল পাঠিয়েছিল, তারা খুব ভাল করে জানত আমি কার্গিল যাব। এর মানে হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ভেতর থেকে খবর লিক হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে সে আর প্ল্যানিং সামথিং বিগ হিয়ার, যার জন্য আমাকে শুধু থ্রেট দিয়েই থেমে থাকে নি, প্রায় মেরেই ফেলেছিল"।

বীরেন কিছু একটা বলার আগেই তার ফোন বেজে উঠল। দেখল রেহান ফোন করছেন। সিস্টার দূর থেকে আপত্তি জানালেন, "বাইরে গিয়ে ফোন ধরুন"।
বীরেন বলল "রেহান স্যার ফোন করছেন"।
খান বললেন "ঠিক আছে, তুমি ফোনটা ধরে এসো"।
বীরেন আই সি ইউ থেকে বেরিয়ে ফোনটা রিসিভ করল। ওপাশ থেকে রেহানের উত্তেজিত গলা ভেসে এল "বীরেন। তুমি খানের কাছেই আছো তো?"
বীরেন বলল "হ্যাঁ, কেন স্যার?"
রেহান বললেন "ওখানেই থাকো। আমি সিকিউরিটি পাঠাচ্ছি আরও। এই মাত্র ট্রাফিক থেকে ফোন এসেছিল। যে লোকটা আমাদের সঙ্গে এল, সে একটা বাইক ছিনতাই করে পালাচ্ছিল। কী আশ্চর্য আজকাল চোর ছ্যাঁচড়ের চেহারা দেখেও চিনতে পারছি না আমি। যাই হোক, এর মানে হল হসপিটালে ঢোকাই ওর লক্ষ্য ছিল, অ্যাক্সিডেন্টটাও প্রি প্ল্যানড। আমি আসছি এখনই। তার আগে অবধি আশরফের দায়িত্ব তোমার"।
বীরেন ফোনটা রেখে আই সি ইউতে দৌড়ল।

৩৭।
জ্যোতির্ময়কে ইন্টারোগেশন টেবিলে হাত পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। প্রায় আট ঘন্টা জল দেওয়া হয় নি।
জ্যোতির্ময় একবারও কিছু খেতে চান নি। চোখ বুজে বসে আছেন। মাঝে মাঝে পা দোলাচ্ছেন। তুষার বাইরে থেকে বেশ কিছুক্ষণ জ্যোতির্ময়কে দেখছিলেন।
পীযূষ এসে বললেন "স্যার। একজ্যাক্ট লোকেশন ট্রেস করেছে রাসেল। জায়গাটা বর্ডার থেকে বেশি দূরে না"।
তুষার বললেন "হু"।
পীযূষ উত্তেজিত গলায় বললেন "কিছু তো করতে হবে স্যার?"
তুষার পীযূষের দিকে তাকিয়ে বললেন "কী করব বল? মিনিস্টার আমার ফোনই ধরছেন না। আরেকটা কান্ট্রির টেরিটরিতে গিয়ে অপারেশন চালানোটা উইদাউট পারমিশন কিছুতেই করা যাবে না"।
পীযূষ বললেন "মেয়েটার বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার আমাদের ফোন করেছে স্যার"।
তুষার ম্লান মুখে বললেন "আমাকেও করেছে। ধরি নি একবারও"।

পীযূষ বললেন "বিডি আরের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করব? এখন মিজানুল হক সাহেব আছেন ওপাশে, ভদ্রলোক বেশ অনেস্ট অফিসার"।

তুষার পীযূষের দিকে তাকালেন "বেশ। তুমি কন্ট্যাক্টগুলো রেডি কর। আমি দেখছি"।

পীযূষ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তুষার জ্যোতির্ময়ের ঘরে প্রবেশ করলেন।

জ্যোতির্ময় উঠলেন না। চোখ বুজে বসে রইলেন।

তুষার বললেন "মেয়েটাকে শুনলাম আপনিই কোলে পিঠে করে বড় করেছেন?"

জ্যোতির্ময় উত্তর দিলেন না।

তুষার বললেন "ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া সম্পর্কে আপনার ডেহাদ কী বলছে মিস্টার মাকসুদ?"

জ্যোতির্ময় এবার চোখ খুলে বললেন "আমার ভাইঝিকে আমি আপনার থেকে বেশি ভালবাসি মিস্টার তুষার রঙ্গনাথন। আমি ওর জন্য যে ছেলেকে ঠিক করে দিয়েছি, সে এসব করবে না"।

তুষার হাসলেন "বটে? তা গোটা হিন্দুস্তানে একটা ছেলে পেলেন না? বাংলাদেশ যেতে হল?"

জ্যোতির্ময় আবার চোখ বুজে বললেন "ছেলের বাবা বাংলাদেশী নয়। পাকিস্তানি"।

তুষার বললেন "ওহ। তা এত পাকিস্তানপ্রীতি কেন আপনার? না, মানে পাকিস্তান সম্পর্কে আমার কোন অন্ধ জাতিগত বিদ্বেষ নেই, তবু জানতে ইচ্ছা হয় বই কি"।

জ্যোতির্ময় বললেন "রোজার মাস ছাড়া রোজা করাচ্ছেন অফিসার। আপনার ঈশ্বর পাপ দেবে তো"।

তুষার বললেন "আমার কোন ঈশ্বর নেই হাসান মাকসুদ। যে থাকুক বা না থাকুক, যার থাকা বা না থাকায় আমার জীবনে কোন হের ফের হবে না, তার অস্তিত্বকে আমার মেনে নিতে সমস্যা আছে। আপনি তো প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। আপনার কখনো মনে হয় নি, ধর্মের দোহাই দিয়ে এইসব খুনোখুনি আদতে আমাদের কোথাও নিয়ে যায় না?"

জ্যোতির্ময় শব্দ করে হেসে বললেন "যাবে, যাবে, নিয়ে যাবে। আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? উনি ঠিক নিয়ে যাবেন আমাদের সবাইকে, যেখানে আমরা যেতে চেয়েছিলাম"।

তুষার বাঁকা গলায় বললেন "কোথায় যেতে চেয়েছি আমরা হাসান মাকসুদ? সিরিয়া? না সোমালিয়া?"

জ্যোতির্ময় বললেন "জল খাওয়ান"।

তুষার বললেন "আপনার ঈশ্বরকে বলুন না। ঠিক জলের ব্যবস্থা করে দেবে। খেতেও উনিই দেবেন। আমরা খামোখা কেন আপনার জন্য ক্যান্টিনের ভাত ডাল নষ্ট করব বলুন?"

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বললেন "কেউ বাঁচবে না। কেউ বাঁচবে না। সবাইকে ওর কাছেই যেতে হবে"।

তুষারও হাসলেন। বললেন "বেশ তো। যাবে। তা ওখানে গিয়ে কী হবে? আপনি তো এককালে হিন্দু ছিলেন। আপনিই বলুন। ওর কাছে গিয়ে কী হবে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "সব হিসেব নেবেন উনি"।

তুষার বললেন "কেন? উনি কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট? ওঁর খেয়েদেয়ে কাজ নেই বসে বসে সবার হিসেব নেবেন? আচ্ছা হাসান, আপনি তো সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড লোকও তো নন। দিব্যি বউ আছে, নিশ্চয়ই অ্যাক্টিভ সেক্স লাইফও ছিল। আপনি এরকম করে পেগলে গেলেন কেন হঠাৎ করে?"

জ্যোতির্ময় রাগী চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "পার্সোনাল কথা না বললেই খুশি হব আমি"।

তুষার বললেন "আপনার মানবাধিকার বাঁচাতে কেউ আসবে না হাসান মাকসুদ। চিন্তা করবেন না। ওহ, আপনার জন্য একটা জিনিস আছে"।

তুষার মোবাইল বের করে গ্যালারি থেকে একটা ছবি বের করে জ্যোতির্ময়ের সামনে রেখে বললেন "আপনার ছেলে। কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরেছে। এটা আপনার ঈশ্বরের কেমন বিচার বলে আপনার মনে হয়?"

জ্যোতির্ময় চোখ খুলে বেশ কিছুক্ষণ ছবিটা দেখে তুষারের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন "আমার ছেলের ওপর আমার গর্ব হয়। আই অ্যাম প্রাউড অফ মাই সান"।

তুষার হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "তা ঠিক, বড় বড় খুনি মাফিয়ারাও এভাবেই নিজের বিপথগামী ছেলে মেয়েদের নিয়ে গর্বিত হন। আপনি কেন তার ব্যতিক্রম হবেন?"

জ্যোতির্ময় বিড়বিড় করে বললেন "কেউ বাঁচবে না। কেউ বাঁচবে না। সবাই আমার ছেলের কাছেই যাবে"।

তুষার মিনিট দুয়েক জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারদের বললেন "ইলেকট্রিক শকের ব্যবস্থা করুন"।

৩৮।

শহর থেকে একটু দূরে একটা বিরাট বড় মহল্লার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ছেলেটা। সায়ক আর আব্বাস গাড়ি থেকে নামলে ছেলেটা সায়ককে বলল "আমি এখানেই অপেক্ষা করছি"।
সায়ক বলল "ঠিক আছে"।
আব্বাস বলল "এটা কোথায়?"
সায়ক বলল "তোমাকে বলেছিলাম তো। জন্নত। পেশোয়ারের ব্রোথেল। পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্রোথেলগুলোর মধ্যে একটা। কেউ কেউ বলে মুঘল হারেমে পেশোয়ারের বারবনিতাদের চাহিদা তুঙ্গে ছিল। বাদশাহ হুমায়ুনের একজন পেশোয়ারের মেয়েমানুষ ছিলেন যিনি নাকি বাদশার নাকে দম দিয়ে রেখে দিতেন"।
আব্বাস জিভ কেটে বলল "তওবা তওবা মিয়াঁ, দেশের কাজ করতে গিয়ে তুমি এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?"
সায়ক বলল "ভাল জায়গা তো। সব রকম অভিজ্ঞতা করা উচিত"।
আব্বাস গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। সায়ক আব্বাসের হাত ধরে টানতে লাগল। আব্বাস বলল "আমি যাব না, প্লিজ মিয়াঁ, খুব ঝামেলা হয়ে যাবে আমি যদি যাই"।
সায়ক কড়া গলায় বলল "কাজে এসেছি আব্বাস, ফালতু সীন ক্রিয়েট কোর না"।
আব্বাস দাঁড়িয়ে পড়ে বলল "কোন কাজে?"
সায়ক বলল "চল, না গেলে বুঝবে কী করে?"
আব্বাস আর প্রতিবাদ করল না। হাঁটতে শুরু করল।
গলির শুরুতেই বিভিন্ন কোণ থেকে আহ্বান আসা শুরু করল। বেশ কয়েকজন পাঠান দরদাম করছে রাস্তায় দাঁড়িয়েই। সায়ক কোন দিকে না তাকিয়ে গলি দিয়ে হেঁটে একটা বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার সামনে বেশ

কয়েকজন মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সায়ক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল "কাজল বেগমকে কোথায় পাব?"

মেয়েগুলো চটুল অঙ্গভঙ্গি করছিল এতক্ষণ ধরে। সায়কের কথায় মুখ চাওয়া চাউয়ি করে বলল "আন্দার। বারো নম্বর ঘর"।

সায়ক আব্বাসকে বলল "এসো"।

বাড়িটা অনেক পুরনো হলেও দেওয়াল বিভিন্ন উত্তেজক ছবিতে ভর্তি। নুপুরের শব্দ ভেসে আসছিল কোন একটা ঘর থেকে। সায়ক দেখল একেকটা ঘরের একেকটা নম্বর। একটু খুঁজতেই বারো নম্বর ঘরটা দেখতে পেল। সে দরজায় নক করল।

ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল "বাদ মে আ। কাস্টমার হে"।

সায়ক আবার নক করল।

এবার ঘরের ভিতর থেকে মহিলা কণ্ঠে তীব্র গালাগাল ভেসে এল। আব্বাস মুখ কুঁচকাল। সায়ক মুখ অবিকৃত করে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজা খুললেন এক মাঝবয়সী মহিলা। কামিজের অনেকটা অংশ খোলা। ঘরের ভিতর এক বুড়ো পাঠান হাফ প্যান্ট পরে বসে আছে। আব্বাস চোখ বন্ধ করল।

মহিলা তেড়ে বললেন "ক্যা রে! আমি যা বলেছি শুনতে পাস নি?"

সায়ক বলল "হায় আপনা দিল তো আওয়ারা। হেমন্তজী"।

মহিলাটি সায়কের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর খাটে বসা পাঠানকে বকে ঝকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করলেন।

ছোট ঘর। একটা ছোট টিভি চলছে। এঘরেও বাইরের ঘরের মতই বিভিন্ন পোস্টার।

সায়ক বলল "ফারুকচাচা আপনাকে ইয়াদ করেছেন কাজলজী"।

কাজল বেগম সালওয়ার ঠিক করতে করতে বললেন "হ্যাঁ। সে তো তোমার মুখে হেমন্তজী শুনেই বুঝেছি। ফোন করেছিলেন। আমার জান বাঁচিয়েছিলেন ফারুক মিয়াঁ। আমার জান কবুল ওঁর জন্য। বল আমি কী করতে পারি"।

আব্বাস অবাক চোখে ঘরের চারদিকে দেখছিল।

সায়ক আব্বাসকে একটা চিমটি কেটে বলল "এই কিছুদিন আগে একজন খুব বড় কোন লোক আপনাদের এখান থেকে চারটে মেয়েকে কোথাও পাঠাতে বলে গিয়েছিলেন?"

কাজল বেগম বললেন "হ্যাঁ। অনেক টাকা দিয়েছেন। উপরওয়ালা ওঁর ভাল করবেন"।

সায়ক বলল "মেয়েগুলো কোথায় গেছে জানা যাবে?"
কাজল বেগম অবাক চোখে বললেন "কেন বল তো?"
সায়ক বলল "দরকার ছিল। ফারুকচাচারই কাজ ছিল একটা"।
কাজল বেগম অবিশ্বাসী মুখে বললেন "কী যে বল! যে লোকটা কোনদিন এখানেই এলেন না, তিনি খোঁজ করবেন ওই মেয়েগুলোর?"
সায়ক পকেট থেকে বেশ কিছু পাকিস্তানি টাকা কাজল বেগমের হাতে দিয়ে বলল "ফারুকচাচার খুব জরুরি দরকার চাচীজান"।
কাজল বেগম টাকাটা নিলেন, কিন্তু মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন "ঝুটী হোগি তেরী মা। অভি তো মে জওয়ান হু"।
সায়ক বলল "তা ঠিক তা ঠিক। আমি অনেক দিন পর আপনার মত একজন সুন্দরী দেখলাম"।
কাজল বেগম সায়কের গালে একটা টোকা দিয়ে বললেন "থাক থাক। তোমার বয়সী আমার একটা ছেলে আছে বুঝেছ?"
আব্বাস জোরে জোরে কাশতে লাগল। সায়ক আবার আব্বাসকে চিমটি কাটল।
সায়ক বলল "তাহলে তো আরও ভাল হল। প্লিজ দিন না অ্যাড্রেসটা"।
কাজল বেগম কয়েক সেকেন্ড সায়কের দিকে তাকিয়ে বললেন "তোমাদের দুজনকে দেখে তো পাঠান বলে মনে হচ্ছে না! তোমরা কারা? এই ঠিকানা দিয়ে কী করবে তোমরা?"
সায়ক বলল "আমার কোন দরকার নেই বিশ্বাস করুন। ফারুক চাচা চেয়েছিলেন"।
কাজল বেগম অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন "আমাদের ব্যবসায় উসুল আছে। কারও সম্পর্কে কোথাও মুখ খুলতে নেই। কিস্সা এই দালানেই শুরু হবে, এই দালানেই শেষ হবে। শুধু আমার জীবনে কয়েক জন মানুষ আছেন যাদের জন্য আমি সব রকম নিয়ম ভাঙতে তৈরী থাকি। তোমাদের কপাল ভাল তোমরা ফারুকভাইয়ের লোক। নইলে সুস্থ শরীরে এখান থেকে তোমাদের বেরোতে দিতাম না"।
আব্বাস ঘামতে শুরু করল।
কাজল বেগম খাটের তোষকের তলা থেকে একটা কাগজ বের করে সায়কের হাতে দিয়ে বলল "ইয়াদ কর লো। হয়ে গেলে কাগজটা আবার আমাকে দিয়ে দাও"।
সায়ক একবার দেখেই কাগজটা কাজল বেগমের হাতে দিয়ে দিল।

কাজল বেগম অবাক হয়ে বললেন "হয়ে গেল?"
সায়ক হাসল "হয়ে গেল। আসি মা জী"।
কাজল বেগম এবার আর মুখ ঝামটা দিলেন না। বললেন "ফারুক সাবকে আমার সেলাম দিও। সাবধানে যেও। গলির মুখের আওয়ারা ছেলেগুলো কিছু বললে আমার নাম বলবে। আর কিছু বলবে না"।
সায়ক বলল "শুক্রিয়া"।
কাজল বেগম চুপ করে রইলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে সায়ক জোরে হাঁটতে শুরু করল।
আব্বাস বলল "উফ! জান বেরিয়ে গেছিল! হয়েছে তোমার কাজ?"
সায়কের মুখে হাসি ফুটে উঠল "হ্যাঁ। চল এবার জাহান্নামটা দেখে আসি"।

৩৯।

বিকেল হয়েছে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি ভিজেছে, খানিকটা জল জমেছে। মোতালেব আলী খুরপি দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল। মনোয়ারা বেগম ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন "নজর রাখবি। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি"।
মোতালেব আলী মাথা নাড়ল। সে বোবা। তবে কালা নয়। কানে শুনতে পায়। বড় সড় চেহারা। বসে থাকতে পারে না। কিছু না কিছু কাজ করেই যাবে সব সময়।
মিনি ঘরে শুয়েছিল। কাপড় কাচার ফলে তলপেটে চাপ পড়েছিল। অনেকটা ব্লিডিং হচ্ছিল তার।
মনোয়ারা বেগমকে বেরোতে দেখে মিনি দরজা খুলে বেরোল।
মোতালেব মাটিতে বসে ছিল। মিনিকে বেরোতে দেখে উঠে দাঁড়াল।
মিনি মোতালেবের দিকে তাকিয়ে রইল। মোতালেব চোখ নামাল।
মিনি বাড়ির সামনের বসার জায়গাটায় বসল। বাড়ির সামনে এক চিলতে বাগান করার জায়গা। তারপরে রাস্তা শুরু। মাটির রাস্তা।
পাশের বাড়িটা এ বাড়ি থেকে একটু দূরে। মিনি কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকাল। বাড়ির ভেতর থেকে টিভির শব্দ আসছে। জোরে চিৎকারের ইচ্ছাটা মিনি দমন করল।
বাংলাদেশের কথা অনেকবার শুনেছে বাড়িতে, মিনির পড়ে গেল বাবা প্রায়ই বলত বাংলাদেশে বেড়াতে যাবার কথা। কিন্তু কোনদিন সুদূর কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি, তাকে এভাবে এ দেশে আসতে হবে।

একটা বড় গাড়িতে এল নাজিব। বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে এসে তাকে বলল "কী দেখছ? মোত্তালেবকে? নিজে কথা বলতে পারে না কিন্তু মেয়েছেলেদের মুখ থেকে নানা দাদার নাম বের করে আনতে পারে"।
মিনি নাজিবের দিকে তাকাল না। চুপ করে বসে থাকল।
নাজিব মিনির হাত ধরে বলল "চল ঘরে চল"।
মিনি বলল "হাত ছাড়ুন"।
নাজিব বলল "আমি ভাল ভাবে নিয়ে যাচ্ছি, গেলে চল, নইলে কিন্তু মোত্তালেবকে ডাকব"।
মিনি ক্ষোভের চোখে নাজিবের দিকে তাকিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে ঘরের ভিতর রওনা দিল।
নাজিব ঘরে এসে তার সামনেই জামা, প্যান্ট ছেড়ে স্যান্ডো গেঞ্জি আর জাঙ্গিয়া পরে খাটে বসে বলল "তোমার রক্তপাত কবে শেষ হবে?"
মিনি বলল "জানি না"।
নাজিব বলল "সত্যিই পড়ছে তো, নাকি মিথ্যা দিচ্ছি?"
মিনি বলল "দেখতে পারেন। দেখবেন?"
নাজিব খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলল "দেখব দেখব, এত জলদি কীসের?"
মিনির কান মাথা ঝা ঝা করছিল। সে ঘরের বাইরে গেল।
নাজিব উঠে মিনির হাত ধরে খাটে তার পাশে বসিয়ে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল "কোই যাও, কোলে বস না"।
মিনি বলল "আমার শরীর খারাপ। আপনি আমাকে না ধরলেই খুশি হব। আর দয়া করে পোশাক পরুন"।
নাজিব মিনির ঘাড়ে একটা চুমু খেল। মিনি ছিটকে গেল। নাজিব হাসতে হাসতে বলল "কী হল? এত লজ্জা কেন তোমার?"
মিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল "আপনাকে বলেছি আমার শরীর খারাপ। এসব কেন করছেন?"
নাজিব বলল "শরীর খারাপ তো কী হয়েছে? এদিকে আসো না, তোমাকে দেখাচ্ছি শরীর খারাপ থাকলেও শরীর ভাল করা যায়"।
নাজিব নিজের জাঙ্গিয়ায় হাত দিল।

মিনি আর পারল না। হড় হড় করে বমি করে দিল। নাজিব হাসতে হাসতে বলল "ওরে আমার অভ্র মাগী রে, কত অভ্র মাগী। তোর কপালে যে কী আছে তা তুই নিজেও জানিস না"।
মিনি বাথরুমে দৌড় দিল। দরজা বন্ধ করে কল ছেড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল।

৪০।
ইসলামাবাদ প্রেসিডেন্ট ভবন বা আইয়ান এ সদর।
নিয়াজির ঘুম ভাঙল সকাল নটায়। ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেছিল। অন্য বিছানায় ঘুম আসে না চটজলদি।
শেষ রাতের দিকে তার ইচ্ছা হচ্ছিল ক্যান্টনমেন্টে নিজের কোয়ার্টারের বিছানাতে গিয়েই ঘুমাবেন। অনেক পরে ঘুম এসেছিল।
ঘুম ভেঙে উঠে জেনারেল নিয়াজি জানলা খুললেন। নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ল তার যখন করাচীর রাস্তায় ক্রিকেট খেলতেন বন্ধুদের সঙ্গে। জানলার বাইরের লনটা কী সুন্দর। মাঠের অভাবে তাদের রাস্তায় খেলতে হত। আর এখানে মাঠ পড়ে আছে খেলার ঠিক নেই।
নিয়াজি ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে সবার আগে ফোন করলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ আলি আব্বাসকে। আব্বাস তার ফোন পেয়ে খানিকটা ঘাবড়েই গেলেন।
নিয়াজি বললেন "পাকিস্তান ক্রিকেটের কী হাল আব্বাস?"
আব্বাস বললেন "হাল খুব একটা ভাল না স্যার। আমাদের দেশের মাটিতেই কোন দেশ খেলতে আসতে চায় না নিরাপত্তার অভাবে। ইন্ডিয়া পাকিস্তান সিরিজ একটা হলে তো খুবই ভাল হত যেমন জেনারেল মুশারফের আমলে হয়েছিল"।
নিয়াজি বললেন "আমি ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সিরিজ করার ব্যবস্থা করুন"।
আব্বাস ইতস্তত করে বললেন "কিন্তু স্যার সিকিউরিটি... বিশেষ করে জামাল পাশা স্যারের..."
নিয়াজি বললেন "সেটা আমি বুঝব। আপনি ব্যবস্থা করুন। এই সিরিজের ফলে প্রচুর রেভিনিউ আসবে যেটা আমাদের ইমিডিয়েটলি দরকার। আর শুনুন, দেশের প্রতিটা শহরে ক্রিকেট অ্যাকাডেমী তৈরী করুন। বাচ্চাদের খেলার মাঠের

ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করুন। আমি চাই পরের ওয়ার্ল্ড কাপ যেন পাকিস্তানে আসে"।

আব্বাস বললেন "ইয়েস স্যার। কিন্তু এর জন্য কিছু গ্রান্টের দরকার হবে"।

নিয়াজি বললেন "আপনি ফাইল তৈরী করুন। আজ বিকেলেই আসুন আমার হাউজে। আমি কথা বলব আপনার সঙ্গে সামনা সামনি"।

আব্বাস বললেন "ওকে স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ"।

নিয়াজি ফোন রাখলেন। তার মনে হল, আর্মি জীবনে যে শৃঙ্খলা পালন করে চলতে হয়, একটা দেশের কর্ণধারের তো সে বালাই নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, স্বয়ং ঈশ্বরের সমতুল্য। চাইলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

ইংলিশ ব্রেকফাস্ট করলেন। খেয়ে হাউজ থেকে বেরিয়ে সিকিউরিটি চিফ মাসুদ হককে বললেন "কনভয় বের করুন। আমি শহর ঘুরতে চাই"।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইসলামাবাদের বিভিন্ন এলাকায় নিয়াজি গাড়ি দাঁড় করালেন। কখনও শহরের মেয়রকে বকা ঝকা করলেন, কখনও সেনা ছাউনিতে গিয়ে সেনাদের সঙ্গে কথা বললেন। কোথাও বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা দেখে কনভয় দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের বললেন বাচ্চাদের চকলেট বিলি করতে। এক অদ্ভুত প্রশান্তি বোধ করছিলেন। একটু একটু করে বুঝতে পারছিলেন দেশের নেতা মন্ত্রীরা কেন শত কষ্ট সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চিপে গদিতে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়। ক্ষমতায় থাকার স্বাদটাই আলাদা। প্রতিটা মানুষ যখন তার দিকে সম্ভ্রমের চোখে তাকাবে, তার একটা আলাদা অনুভূতি আছে। নিজের অপছন্দের লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যেও একটা স্বর্গীয় সুখ আছে।

দুপুর নাগাদ হাউজে যখন ফিরলেন তখন দেখলেন গুলাম মহম্মদ তার জন্য অপেক্ষা করছেন। গাড়ি থেকে নেমে হাউজের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বললেন "কী ব্যাপার? এরকম কাচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে কেন?"

গুলাম বললেন "আলাদা কথা আছে স্যার"।

নিয়াজি ড্রয়িং রুমে গিয়ে সিকিউরিটিদের বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। গুলাম মহম্মদকে বললেন "বস"।

গুলাম বললেন "স্যার, আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলেন"।

নিয়াজি মুখ বিকৃত করে বললেন "এ দেশের প্রেসিডেন্ট একজনই গুলাম। সেটা আমি। ওঁরা তো নাম কা ওয়াস্তে প্রেসিডেন্ট। আমার সঙ্গে যখন এদের ব্যাপারে কথা বলবে, তখন এদের প্রেসিডেন্ট বলে না ডাকলেও চলবে"।

গুলাম বললেন "জী জনাব"।
নিয়াজি বললেন "এবার বল কী বলছে আজাদ কাশ্মীরের হারামখোরটা"?
ঘরে যদিও কেউ ছিল না তবুও গুলাম চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন "মুস্তাক জিমরি ওকে ফোন করেছিল। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে"।
নিয়াজি বললেন "কখন কথা বলবে? আর কারও মাধ্যমে আমি কথা বলতে চাই না। যা কথা হবে, সামনা সামনি হবে"।
গুলাম বললেন "জনাব, এল ও সির দশ কিলোমিটারের মধ্যে বেশ কয়েকটা লস্কর বেস হয়েছে। মুস্তাক জিমরি চাইছে, আর্মি এখন বেশ কয়েক দিন বর্ডারে ফায়ারিং করুক, সেই ফাঁকে ওদের একটা গ্রুপ ইন্ডিয়াতে ঢুকবে অন্য পয়েন্ট দিয়ে"।
নিয়াজি বিরক্ত গলায় বললেন "এসবের জন্য আমার সঙ্গে কথা বলার কী দরকার? আমরা তো বরাবরই ওদের এ ব্যাপারে হেল্প করে আসি"।
গুলাম বললেন "আর্মি তো জনাব আপনার কথা শুনেই চলবে। এই সময়টা ক'দিন যুদ্ধ বিরতি চলছিল বলে কোন ঝামেলা হয় নি। ইন্ডিয়ান আর্মিও ভেবে নিয়েছে আপনি প্রেসিডেন্ট হবার ফলে খানিকটা শান্তি আসবে। এই সময়েই কিন্তু আমাদের অ্যাটাক করার সুবর্ণ সময়। আপনি বললে আজ রাত থেকেই ফায়ারিং শুরু করবে আর্মি"।
নিয়াজি বললেন "শুরু করতে বল। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমার কাছে আসার দরকার নেই। তুমি আছো, তুমি দেখে নেবে"।
গুলাম ইতস্তত করে বললেন "ঠিক আছে জনাব, আপনি যেমন চান"।
নিয়াজি বললেন "আচ্ছা শোন, ইন্ডিয়া পাকিস্তান ক্রিকেট সিরিজ শুরু করতে হবে। আমি আব্বাসের সঙ্গে সকালে কথা বলেছি"।
গুলাম বললেন "ইন্ডিয়া আসবে না স্যার। বর্ডারে গুলি গোলা চললে আরও আসবে না"।
নিয়াজি রেগে গেলেন "কেন আসবে না? বর্ডারের সঙ্গে ক্রিকেট মেলাবে কেন?"
গুলাম বললেন "সেটা তো আমি বলতে পারব না জনাব। ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার বলতে পারবেন। যতক্ষণ না বর্ডার ঠাণ্ডা হবে, ইন্ডিয়া খেলবে না"।
নিয়াজি বললেন "তা বেশ তো। এক কাজ করা যাক, এখন যুদ্ধবিরতিটা বজায় থাক। আব্বাসকে বলে দাও একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করা যাক। নাম হবে

আমাদ কাপ। ইন্ডিয়া যখন এই দেশে আসবে তখন বর্ডারে ফায়ারিং শুরু করা যাবে"।

গুলাম হেসে বললেন "আইডিয়া তো খুব ভাল জনাব, কিন্তু তার জন্য মুস্তাক অতদিন অপেক্ষা করবে নাকি, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন"।

নিয়াজি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "মুজাফফরাবাদ যাব আমি। কালকেই। ব্যবস্থা কর"।

৪১।

রাত আটটা। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। বাজ পড়ছে।

বাড়িতে থাকলে প্রবল বৃষ্টিতে মিনি দরজা জানলা বন্ধ করে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাত। এখানে সে উপায় নেই।

বিদ্যুৎ নেই। হ্যারিকেন জ্বালানো হয়েছে মাজেদের ঘরে। মিনি একটা চেয়ারে বসে আছে। মনোয়ারা বেগম মোম জ্বালিয়ে রান্না করছেন। নাজিব মোবাইলে জোরে জোরে গান চালিয়ে বুলবুলের মত মাথা নাড়াচ্ছে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বলে মোতালেবকেও ঘরের ভিতরে ডাকা হয়েছে। মোতালেব খালি গায়ে বসে আছে। মাছের মত চোখ মোতালেবের। চুপচাপ বসে আছে ঘরের এক কোণে।

নাজিব গান শুনতে শুনতে বলল "তুমি গান করতে পারো?"

মিনি বলল "না"।

নাজিব খুশি হয়ে বলল "খুব ভাল। বেহায়া মেয়েরা গান করে, নাচ করে। শরীর প্রদর্শন করে"।

মিনি কিছু বলল না।

নাজিব বলল "আচ্ছা ঘরে চল। একটা জিনিস দেখাব"।

মিনি বলল "এখানেই ঠিক আছি"।

নাজিব বলল "চল না। এখানে মোতালেব আছে তো। চিন্তা নেই"।

মিনি বলল "অন্ধকার, কিছু দেখতে পাচ্ছি না"।

নাজিব মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে মিনিকে বলল "এসো, আমার সঙ্গে এসো"।

মিনি উঠল। ধীর পায়ে বেডরুমে গেল। নাজিব দরজা বন্ধ করে উৎসাহী গলায় বলল "বস, বস একটা জিনিস দেখাই"।

মিনি বসল।

নাজিব মোবাইলে একটা পর্ণ চালিয়ে মিনির হাতে দিয়ে বলল “দেখো, কী দারুণ”।

মিনি কিছুক্ষণ দেখে বলল “এটা দেখেছি”।

নাজিব মিনির হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে বলল “তুমি ব্লু ফিল্ম দেখো?”

মিনি বলল “হ্যাঁ, দেখেছি”।

নাজিব রেগে গেল। অন্ধকারের মধ্যে মিনির চুলের মুঠি ধরে বলল “মহা বেশরম মেয়ে তুমি! লজ্জা করে না এগুলো দেখতে?”

মিনি বলল “আপনিই তো দেখালেন। আপনার লজ্জা লাগছিল না দেখানোর সময়”?

নাজিব মিনির চুল ছেড়ে ফুঁসছিল। বলল “আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। কলকাতার মেয়ে। আর কী হবে?”

মিনি উত্তর দিল না। নাজিব বলল “হাসানচাচার কথা শুনে মনে হত তোমার মত ভাল মেয়ে আর এই দুনিয়ায় নেই”।

মিনি বলল “আপনার ধারণাটাই ভুল। পর্ণ দেখলে কেউ খারাপ হয়ে যায় না। আর আপনি যখন আমাকে এটা খারাপ জেনেও দেখাতে গেছেন তার মানে নিশ্চয়ই আপনার মনেই পাপ ছিল”।

নাজিব রেগে গিয়ে বলল “একদম বেশরমের মত মুখে মুখে কথা বলবে না। খুব রস তোমার ওখানে তাই না? দাঁড়াও। এখনই তোমার বিষ ঝাড়ছি”।

নাজিব রেগে ঘর থেকে বের করে দিল। কয়েক সেকেন্ড পর মোত্তালেবকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকের আলো জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকছে।

একসঙ্গে অনেকখানি ভয় মিনিকে ঝাপটে ধরল। সে চেঁচিয়ে উঠল “এ কী ধরণের অসভ্যতা?”

বাইরে থেকে নাজিবের হাসির শব্দ ভেসে এল।

মিনি খাটের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মোত্তালেব মেঝের ওপর চুপ করে বসে পড়ল।

মিনি যখন বুঝল মোত্তালেব বসে পড়েছে, সে খাটের কোণায় গিয়ে বসল।

বাইরে থেকে নাজিবের মোবাইলের গান, মনোয়ারা বেগমের রান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

মিনি প্রবল আতঙ্কে বসে থাকল।

খানিকক্ষণ পর বিদ্যুৎ এল। ঘরের আলো জ্বলে উঠল। মিনি দেখল মোতালেব চোখ বন্ধ করে মেঝেতেই বসে বসে ঘুমাচ্ছে।

সে উঠে দরজা ধাক্কা দিল। দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দে মোতালেবের ঘুম ভাঙল কিন্তু সে মেঝেতেই চুপ করে বসে রইল।

নাজিব দরজা খুলল। তার দিকে নিজের ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলল "নে কথা বল। বাড়িতে বল, হাসান মাকসুদকে ছেড়ে না দিলে তোকে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াব"।

মিনি কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা ধরল।

মায়ের ফোন নাম্বার তার মুখস্ত। ডায়াল করল। নাজিব বলল "আই এস ডি কর। এভাবে ফোন যায় না। দে ফোনটা"।

মিনির হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নাজিব ভারতের আই এস ডি কোডটা দিয়ে বলল "এবার নাম্বারটা দে"।

মিনি মায়ের ফোনটা একবারে পেল না। চার পাঁচবার চেষ্টার পরে পেল। মায়ের গলা পেতেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। এই দুদিনকেই তার অনন্তকাল মনে হচ্ছিল।

৪২।

রাত দশটা।

তুষার মাথা নিচু করে চেম্বারে বসে ছিলেন। দেখলেন ইরাবতী ফোন করছেন, ধরলেন তিনি "বল"।

"কী খবর তোমার? দিল্লি ফিরছ কবে?"

তুষার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "দেখছি। এখন অবধি কোন কিছু ঠিক নেই"।

ইরাবতী বললেন "ডিনার করেছ?"

তুষার বললেন "নাহ"।

ইরাবতী বললেন "খেয়ে নিও"।

তুষার বললেন "তুমি কি কিছু বলতে চাইছ?"

ইরাবতী একটু ইতস্তত করে বললেন "হ্যাঁ মানে একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার ঘটছে"।

তুষার বললেন "কী?"

ইরাবতী বললেন "আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, কেউ আমাকে ফলো করছে। আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মনে হল কেউ একজন স্কুটারে ফলো করছে। বাড়ি ফেরার সময়েও একই ব্যাপার"।

তুষার বললেন "ওকে, তুমি চিন্তা কোর না, আমি দেখে নিচ্ছি ব্যাপারটা"।

ইরাবতী বললেন "তুমিও সাবধানে থেকো"।

তুষার ফোনটা রাখলেন।

দিল্লিতে ডিপার্টমেন্টে ইরাবতীর জন্য একজন নিরাপত্তারক্ষীর কথা বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করলেন।

বেশ কয়েক বার রিং হয়ে যাবার পর মন্ত্রী ধরলেন "আমি তোমাকে আমার ডিসিশন জানিয়ে দিয়েছি তুষার। এর পরে আর আমাকে ফোন কোর না। তুমি চাইলে আমি ওকায় কথা বলতে পারি"।

তুষার একটু চুপ করে থেকে বললেন "আমি অন্য কারণে ফোন করছি স্যার"।

"ওহ, রিয়েলি? বল তাহলে"।

"ইন্টেলিজেন্স সূত্রে একটা খবর পেয়েছি। কয়েক জন লস্কর জঙ্গি আপনার নাতিকে টার্গেট করেছে। স্কুল থেকে আসার সময় কিডন্যাপ করতে পারে। আমি দিল্লিকে অ্যালার্ট করে দিয়েছি বটে তবু মনে হল আপনারও জেনে রাখা ভাল"।

"ওহ মাই গড। কখন জানতে পারলে?"

"দুপুরেই স্যার"।

"এখন জানালে?" মন্ত্রী ক্রুদ্ধ গলায় বললেন।

"আপনাকে সারা দিনে বার বার ফোন করছি, আপনিই তো ফোন ধরেন নি স্যার"।

"আমি কী করে জানব আমার নাতির ব্যাপারে ফোন করছ? আমি তো ভেবেছিলাম সেই ব্লাডি হাসানের ভাইঝির জন্য। ওকে, আমি বলে দিচ্ছি। নাতিকে স্কুলে পাঠাচ্ছি না ক'দিন"।

"ওকে স্যার। জয় হিন্দ"।

ফোনটা রেখে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন তুষার। এর পর থেকে দ্বিতীয়বার আর তার ফোন না ধরার সাহস করবেন না মন্ত্রী।

টেবিলে মাথা রেখে একটু চোখ বুজলেন। ঠিক করেছেন মাঝরাতে জ্যোতির্ময়কে আবার জেরা করতে যাবেন।

আন নোন নাম্বার থেকে ফোন আসছে।

তুষার ধরলেন "হ্যালো"।

"এর মেরে ওয়াতান কে লোগো"।

"ওহ। সায়ক। বল। ইজ দিস লাইন সিকিওর? কোথায় আছো তুমি?"

"ইয়েস স্যার। হান্ড্রেড পারসেন্ট সিকিওর। পেশোয়ারেই আছি। আই হ্যাভ এ বিগ লিড স্যার"।

"আই? কী ব্যাপারে?" নড়ে চড়ে বসলেন তুষার।

"স্যার কাশেম সোলেমানি ইজ ইন পেশোয়ার স্যার"। একটুও উত্তেজিত না হয়ে কথাগুলো বলল সায়ক।

তুষার থমকে বললেন "শিওর?"

"একদম স্যার। সরফরাজ খানের আতিথেয়তায় আছে"।

"প্রমাণ আছে তোমার কাছে?"

"হ্যাঁ স্যার। কয়েকটা ফটো পাঠাচ্ছি। দেখে নিন। আশা করি বুঝতে পারছেন লিডটা কত বড়?"

"বুঝতে পারছি। তুমি একজ্যাক্ট লোকেশনটা পেয়েছ?"

"ইয়েস স্যার। কো অরডিনেটটা মেইল করছি আপনাকে"।

তুষার উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, "সিকিউরিটি সিস্টেম কেমন সেখানে?"

"স্যার গ্রামের মধ্যে দুর্গের মত বড় বাড়ি। বেশ কয়েকজন আর্মস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে"।

"সরফরাজ খান যে ওই বাড়িতে যায়, তার প্রমাণ আছে?"

"পেয়ে যাবেন স্যার, নজর রাখছি। পেলেই আপনাকে পাঠাব"।

"দিস ইজ এ বিগ লিড সায়ক। এই মুহূর্তে মুজফফরাবাদের মত ভুলটা করতে যেও না তুমি। তুমি দূর থেকেই নজর রাখো। আমি দেখছি কী করা যায়"।

"কিন্তু স্যার, বাড়ির ভেতর না যেতে পারলে তো দরকার আর কিছুই জানা যাবে না সেভাবে"।

"তোমাকে যা বলছি সেটাই কর সায়ক। অনেক দুঃসাহস দেখিয়েছ আগে। এবারে হাত জোর করছি, সিচুয়েশনের ওপর নজর রাখা ছাড়া আর কিছু করতে যেও না দয়া করে"।

"ওকে স্যার। গুড নাইট"।

"গুড নাইট"।

ফোনটা রাখতে তুষার দেখতে পেলেন সোমেনের মিসড কল। তিনি কল ব্যাক করলেন। ওপাশ থেকে অনিন্দিতা ধরলেন "স্যার, কোন খবর আছে?"

তুষার থমকে বললেন “চিন্তা করবেন না, আমরা চেষ্টা করছি”।
অনিন্দিতা বললেন “ফোন করেছিল মেয়েটা। ওর গলার স্বর আমার স্বাভাবিক লাগল না স্যার। বলছে আপনারা ওর জেঠুকে না ছাড়লে ওর ওপর নাকি অনেক টর্চার হবে। প্লিজ স্যার কিছু করুন। আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। ওকে আমিই কলেজ যেতে বলেছিলাম”।
তুষার বললেন “আপনি একদম ভাববেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা মিনিকে উদ্ধার করব”।
অনিন্দিতা কেঁদে যাচ্ছিলেন।
তুষার ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।
তারপর রওনা দিলেন ইন্টারোগেশন রুমে।

৪৩।

একটা লাশ পড়ে আছে হাসপাতালের মেঝেয়। আউটডোর থেকে লবিতে হাঁটতে শুরু করেছিল লোকটা, কিন্তু রেহানের ফোনে জওয়ানরা সচেতন ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সনাক্তকরণ এবং মাথায় গুলি চালিয়ে শুইয়ে দেওয়া গেছে টার্গেটকে।
বীরেন খানের ঘরেই বসে ছিল। কোন রকম উত্তেজনা যাতে খানের মধ্যে সঞ্চারিত হতে না পারে তার জন্য অন্য কথায় ব্যস্ত রেখেছিল খানকে। গুলির আওয়াজ শুনলে খান বিস্মিত গলায় যখন বললেন “কী হয়েছে?”
বীরেন তখন বলল “আমি দেখে আসছি”।
একজন সিস্টারকে বলে বীরেন এক তলায় নেমে দেখল জওয়ানরা হাসপাতালের দখল নিয়ে নিয়েছেন। রেহান খান এসে পৌঁছেছেন। তাকে দেখে দৌড়ে এসে বললেন “আশরফ ঠিক আছেন তো?”
বীরেন মাথা নাড়ল।
রেহান বললেন “থ্যাঙ্ক গড”।
বীরেন লাশটা দেখছিল। কিছুক্ষণ আগেই লোকটা তার পাশে বসে ছিল গাড়িতে। এই টুকু সময়ের মধ্যে এত কিছু হয়ে গেল? রেহান জওয়ানদের কিছু নির্দেশ দিয়ে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন “লোকটা শ্রীনগরেরই লোক। আপনার ব্রেইন ওয়াশড ম্যান”।
দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন খান।

বীরেন বলল "এও তো হতে পারে, লোকটা আসলে কাউকে মারতে আসে নি... সত্যি সত্যিই ইনজুরিটা ছিল"।

রেহান বললেন "হতেই পারে। বাট উই কান্ট টেক রিস্ক। ছিনতাই শুনে আমাকে দুয়ে দুয়ে চার করতেই হল"।

বীরেন অবাক চোখে রেহানের দিকে তাকিয়ে থাকল। ছিনতাই এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তবে?

রেহান বীরেনের কাঁধে হাত রাখলেন "আমাদের এভাবেই অ্যাসাম্পশন করে এগোতে হয় বীরেন। আমরা কোনভাবেই কোন রিস্ক নিতে পারি না। তিন মাস আগের কথা। একটা লোক এভাবেই ডাল লেকের একটা হাউজবোটে আচমকা ঢুকে তিনজন আমেরিকান নাগরিককে গুলি করে মেরেছিল। তুমি এখানে থেকো না, হয় খানের কাছে যাও, নইলে আনোয়ারকে বলে দিচ্ছি, তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নাও"।

বীরেন বলল "আমি খান স্যারের কাছে যাচ্ছি"।

রেহান বললেন "ওকে। চল আমিও যাব"।

কয়েকজন জওয়ান লাশটাকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে রক্ত পড়ে আছে। বীরেনের শরীর খারাপ লাগছিল। রেহান সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললেন "ইউ হ্যাভ টু বি স্ট্রং এনাফ টু ওয়ার্ক ইন আওয়ার ডিপার্টমেন্ট বীরেন। ডোন্ট থিংক অ্যাবাউট ইট। আমরা সামলে নেব"।

বীরেন বলল "প্রতিদিন এরকম কতজন কাশ্মীরিকে আপনারা সন্দেহের বশে মেরে ফেলেন?"

রেহান সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন "ভারতটা সবার দেশ বীরেন। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য কেউ সাংঘাতিক থ্রেট হয়ে উঠলে আমাদের ব্যবস্থা নিতেই হয়"।

বীরেন বলল "দেশের সর্বত্র সবার জন্য আপনাদের আইন সমান?"

রেহান বললেন "না। সেটা আমার থেকে ভাল কেউ জানে না।। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা। আমরা কেউ নিরীহ মানুষদের খুন করতে চাই না। কিন্তু এই ধরণের অ্যাক্টিভিটি আমাদের অ্যাগ্রেসিভ করতে বাধ্য করে। জাস্ট ইমাজিন লোকটা হাসপাতালে একটা আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ করত এবং কয়েকটা লোক মারা যেত, সেক্ষেত্রে কী হত?"

বীরেন বলল "লোকটাকে তো না মেরে ধরাও যেত"।

রেহান মাথা নাড়লেন "তোমাকে তো বললাম আমাদের প্রম্পট ডিসিশন নিতে হয়। কিছু করার থাকে না"।

বীরেন বুঝল রেহান সুকৌশলে তার প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন।

আই সি ইউতে ঢুকে রেহান ডাক্তার রশিদের সঙ্গে কথা বললেন। চপারের কথা বলায় ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন "এই অবস্থায় জার্নিটা রিস্ক হয়ে যেতে পারে"।

রেহান গলা নামিয়ে বললেন "কাশ্মীরে হি ইজ নট সেফ স্যার"।

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন "ওকে, তবে চপারে নয়। ওকে ফ্লাইটেই দিল্লি পাঠান। চপারটা আমার মতে রিস্ক হয়ে যাবে"।

রেহান বললেন "ঠিক আছে, আমি আমার বসের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি"।

রেহান আশরফের সঙ্গে দেখা করে আগামীকালের প্ল্যানের কথা বলে আই সি ইউ থেকে বেরিয়ে দেখল বীরেন চুপ করে বেঞ্চে বসে আছে। বললেন "কী হল? চল এবার"।

বীরেন রেহানের দিকে তাকিয়ে বলল "লোকটার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন আমাকে? আমি দেখতে চাই এর বাড়িতে কে কে আছে। কেন লোকটা এই কাজ করতে এসেছিল। ছিনতাইই বা করতে হল কেন?"

রেহান বললেন "ডোন্ট গেট ইমোশনাল ইন কাশ্মীর বীরেন। সম্ভাল কে রাখো"।

বীরেন কিছু বলল না।

রেহানের ফোন বাজছিল। রেহান ফোন দেখে ভ্রু কুঁচকালেন "অবস্থী স্যার, জেনে গেলেন এর মধ্যে?"

ফোনটা ধরলেন। কয়েক সেকেন্ড কথা বলে ফ্যাকাশে মুখে ফোনটা রেখে বললেন "রামেশ্বর কাল ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিল। জম্মু স্টেশন থেকে বেরোতেই ওকে চারজন গুলি করে পালিয়েছে"।

রেহান কথাটা বলে হাসপাতালের মেঝেতেই বসে পড়লেন।

৪৪।

পেশোয়ার।

রাত বারোটা।

সায়ক চোখ বুজে শুয়েছিল।
আব্বাস নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। সারাদিন অনেক পরিশ্রম হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।
কেউ একজন ঘরে তিন বার নক করলেন। সায়ক বলল "খোলা আছে"।
ফারুক চাচা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। বললেন "তোমার প্ল্যান বল"।
সায়ক বলল "এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কিছু করার নেই। তুষার স্যার এগোতে নিষেধ করছেন"।
ফারুক মাথা নেড়ে বললেন "ঠিকই বলছেন। ওদের গোটা ম্যান পাওয়ার, আর্মস পাওয়ার সম্পর্কে কিছুই না জেনে ওখানে ঢুকতে যাওয়াটা বিরাট বোকামি হবে।
সায়ক গম্ভীর হয়ে বলল "তা ঠিক। আচ্ছা, আমি শুনেছি এই মুহূর্তে পেশোয়ারে অনেক তালিবান আছে যারা মতি মসজিদের গোপন ডেরায় আত্মগোপন করে আছে আমেরিকানদের ভয়ে। এদের মধ্যে কি হাবিবুল্লাহ রসুল থাকতে পারে"?
ফারুক মাথা নাড়লেন "আমার কাছে এ ব্যাপারে কোন খবর নেই। আমার মনে হয় তুমি কাশেম সোলেমানির ওপর কনসেন্ট্রেট করলেই বেশি ভাল হবে"।
সায়ক হাসল "আপনার কি ধারণা আইসিস যদি সাবকন্টিনেন্টে শক্তি বৃদ্ধি করার কথা ভাবে তাহলে তালিবানদের দলে নেবে না?"
ফারুক চিন্তিত গলায় বললেন "সেটা আমিও ভেবে দেখেছি কিন্তু তালিবান জাতটা অত্যন্ত খ্যাপাটে জাত। ওদের মাথাও অতটা সূক্ষ্ম না। কাশেম সোলেমানি এই মুহূর্তে ওদের হাত নাও ধরতে পারে"।
সায়ক বলল "হুঁ। সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন ছিল ততদিন আমেরিকা যত রকম ভাবে পারে চেষ্টা করে গেছে দেশটাকে ভাঙার। যে মুহূর্তে সোভিয়েত টুকরো টুকরো হল, তখন থেকে এই ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোই আমেরিকার গলার কাঁটা হয়ে গেল। তালিবানরা এখনও আমেরিকানদের প্রতি অভিমানী। রেগেও আছে। চোরাগুপ্তা হামলা তো চলেই আমেরিকান ঘাঁটিতে"।
ফারুক বললেন "পেশোয়ার বরাবরই সি আই এর ডেরা ছিল। আমেরিকাকে কখনই বিশ্বাস করা যায় না। এরা ঠিকই জানে, পাকিস্তান কীভাবে টেরোরিজমকে ব্যাক আপ দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে এরা কখনই টেররিস্ট কান্ট্রি বলবে না। পেশোয়ারে এই সেদিনও বোরখা না থাকার জন্য একটা মহিলাকে মাথায় পাথর মেরে মেরে ফেলা হয়েছে। তোমার কি ধারণা আমেরিকা এসব কিছুই জানে না?"
সায়ক বলল "আফগান বর্ডারের কী অবস্থা চাচা?"

ফারুক বললেন "ভুলেও ওদিকে যেও না। আমেরিকা ওত পেতে বসে আছে। আফগান রিফিউজিগুলোরও আমেরিকার ওপর প্রচুর রাগ আছে। দেখে নিও, যে কোন দিন আবার ঝামেলা লাগল বলে"।
ফারুকের ফোন বেজে উঠল। কয়েক মিনিট কথা বলে ফারুক গম্ভীর গলায় বললেন "এই একটু আগে কিসা খাওয়ানি বাজার নিয়াজির আর্মি দখল নিয়েছে। ছাল দিন হচ্ছে। যে কোন দিন আমাদের এখানে চলে আসতে পারে"।
সায়ক ফারুকের দিকে তাকাল, "আপনার কী মত? আমাদের কী করা উচিত?"
ফারুক বললেন "তুমি সরফরাজ খানের সম্পর্কে প্রুফ চাইছ তাই তো?"
সায়ক বলল "হ্যাঁ। কংক্রিট প্রুফ দরকার"।
ফারুক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে বললেন "রিস্কটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। পাকিস্তানি আর্মি খ্যাপা কুকুরের মত পেশোয়ারের প্রতিটা রাস্তা দখল নিচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আমাদের সামনে আর কোন অপশন নেই"।
সায়ক একটা কাগজ নিল। পেন্সিল দিয়ে কাগজের মধ্যে কিছুক্ষণ আগোছালো দাগ কেটে বলল "এই মুহূর্তে একটা ছবি সামনে আসছে। দেখুন, হাসান মাকসুদ গ্রেফতার হল কিংবা আফসানা সাইদ, মীর্জা শেখ মারা গেল, তারপরেও এদের অপারেশন থামে নি। এরা আশরফ খানকে টার্গেট করেছে, কাশ্মীরে ইসলামিক স্টেটের পতাকাও উড়িয়েছে। পকিস্তানের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, জামাল পাশা আর্মির নিজস্ব ক্যান্ডিডেট ছিল। জামাল পাশাকে আর্মি কিছুতেই মারতে পারে না। সরফরাজ খান কাশেমের সঙ্গে দেখা করতে পেশোয়ার আসছে, অংকটা কি মিলাতে পারছেন চাচা?"
সায়কের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
ফারুক চোখ বন্ধ করে ভেবে নিয়ে বললেন "ইসলামিক স্টেট ওদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে ইন্ডিয়ায় ঢুকতে চাইছে এ ব্যাপারে আমিও নিঃসন্দেহ সায়ক, কিন্তু আমার মতে পকিস্তানের পরিবর্তে ওরা নেপাল, ভুটান কিংবা বাংলাদেশ অনেক বেশি প্রেফার করবে। নেপাল, ভুটানের বর্ডার অনেকটাই শিথিল। বাংলাদেশের বর্ডার এখনও সিকিওর নয়"।
সায়ক পেন্সিলটা নিয়ে মন দিয়ে কাগজে একটা চতুর্ভুজ এঁকে বলল "উইং লিড কাশেম সোলেমানি। অ্যাট এনি কস্ট"।
ফারুক বললেন "তোমরা দুজনে মিলে ধরবে? কিংবা ধরে নাও এই বুড়োটাও তোমাদের সঙ্গে থাকল। তিনজনে মিলে কী করব?"

সায়ক অন্যমনস্কভাবে পেন্সিল দিয়ে কাগজে হিজিবিজি আঁকতে লাগল। আব্বাস ঘুমের ঘোরে বলল "লাইটটা বন্ধ কর না মিয়াঁ, ঘুমাতে দাও প্লিজ। আল্লাহ জানেন, কাল আবার কী দিন রেখে দিয়েছেন আমাদের জন্য"।
সায়ক আব্বাসের পেটে একটা খোঁচা মেরে বলল "চাচা এসেছেন। কী বলবে বলছিলে তখন চাচাকে?"
আব্বাস চোখ পিটপিট করে ফারুক চাচার দিকে তাকিয়ে বলল "চাচা, তোমার কাজল বেগম এত খুঁজছে কেন বলত?"

৪৫।
জেনারেল নিয়াজির হেলিকপ্টার মুজফফরাবাদের মাটি ছুঁল সকাল ন'টা নাগাদ। হেলিপ্যাডের কাছে কনভয় দাঁড়িয়ে ছিল। নিয়াজি গুলাম মহম্মদকে নিয়ে এসেছেন।
লিমুজিনে উঠে নিয়াজি বললেন "মুজফফরাবাদ ইজ গেটিং বিউটিফুল ডে বাই ডে। আই মাস্ট অ্যাডমিট"।
গুলাম বললেন "জনাব আমার মনে হয় মুস্তাক জিমরির সঙ্গে কনভারসেশনে আমাদের স্ট্যান্ডটা কী হবে সেটা এখন ঠিক করে দেওয়ার সময় এসেছে"।
নিয়াজি বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন "হু। তোমার আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট তো জামাই আদর করে জিমরিকে নিজের ভবনে নিয়ে এসেছে। এভাবে খুল্লামখুল্লা বাত করলে একবার যদি বিদেশী মিডিয়া খবর পায়, তাহলে আমাদের কপালে দুঃখ আছে"।
পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা ভেজা। কিন্তু এই মুহূর্তে আকাশ পরিষ্কার।
গুলাম বললেন "আজকে আপনার মিটিংটা হয়ে গেলে আর আপনাকে এখানে আসতে হবে না ইনশাল্লাহ। তার পর আমরা ইসলামাবাদ থেকেই কন্ট্রোল করতে পারব। অবশ্য আজকে আপনার না আসলেও হত। আপনি আসবেন বললেন, আমি আর আপনার কথার ওপর কথা বললাম না গতকাল"।
নিয়াজি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট হাউজে নিয়াজির কনভয় প্রবেশ করল।
আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট সর্দার ইউসুফ খান সপার্ষদ দাঁড়িয়ে ছিলেন জেনারেল নিয়াজিকে স্বাগত জানাবার জন্য। নিয়াজি গাড়ি থেকে নামতেই ফুলের

স্তবক দিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন "আমাকে ডাকলেই তো পারতেন জনাব। কী দরকার ছিল এতটা পথ আসার?"

নিয়াজি উদাসীন ভাবে স্তবকটি তার নিরাপত্তারক্ষীর হাতে দিয়ে বললেন "আমি একজন আর্মি ম্যান আলম। পথশ্রমে আমার কষ্ট হওয়া অত সহজ নয়। চল, যে জন্য এলাম, সে কাজটা করা যাক"।

নিয়াজি হাঁটতে শুরু করলেন। খানিকটা আবাচ্যাকা খেয়ে ইউসুফ খান নিয়াজির পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করলেন। আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট হাউজের আসবাবপত্রের সবেতেই কাশ্মীরের সূক্ষ্ম কাঠের কাজের প্রাধান্য। নিয়াজি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ইউসুফ খানকে বললেন "তোমার গোপন কক্ষ কোথায়? আর এঁরা কী আমাদের সঙ্গে থাকবে?"

নিয়াজি ইউসুফ খানের পার্ষদদের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

ইউসুফ খান ব্যস্ত হয়ে বললেন "না জনাব, আসুন আমার সঙ্গে"।

নিয়াজি গুলাম মহম্মদ এবং তার দু জন নিরাপত্তারক্ষীকে বললেন "আমার সঙ্গে এসো"।

ইউসুফ খান প্রায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তাদের।

প্রেসিডেন্ট হাউজের লাইব্রেরী রুমের একটা গোপন দরজা খুলতেই দেখা গেল মুস্তাক জিমরি সোফায় বসে আছেন। পরনে পাঠান পোশাক। গাল ভর্তি দাড়ি, গোঁফ কামানো। মাথায় ফেজ টুপি। নিয়াজিকে দেখে মুস্তাক উঠে দাঁড়ালেন।

নিয়াজি হাত নেড়ে মুস্তাককে বসতে বলে ইউসুফ খানের দিকে তাকালেন "আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন"।

ইউসুফ খান জিজ্ঞাসু চোখে নিয়াজির দিকে তাকালেন।

গুলাম বললেন "প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে বাইরে যেতে বলছেন"।

ইউসুফ খান খানিকটা অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে না দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নিয়াজি বললেন "বল মুস্তাক, তোমার কী চাই"।

মুস্তাক বললেন "জনাবকে অনেক শুক্রিয়া আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এতটা পথ আসার জন্য"।

নিয়াজি হাতে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বললেন "আমার এসব ফেঁদো কথায় সময় নষ্ট করার মত সময় নেই। কাজের কথায় এসো"।

মুস্তাক বললেন "জনাব, সারজিক্যাল স্ট্রাইকের সময় ইন্ডিয়া আমাদের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি নষ্ট করতে পেরেছিল। সুখের খবর আমরা সেসব ঘাঁটিগুলো আবার আগের অবস্থায় আনতে পেরেছি। আল্লাহর রহমতে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোও আবার শুরু করা গেছে। ইন্ডিয়া থেকে হিজবুলের একটা দলও কাঠমান্ডু হয়ে পাকিস্তানে ঢুকতে পেরেছে কিছুদিন আগে। এই মুহূর্তে আমাদের একটাই সমস্যা"।

নিয়াজি চোখ ছোট করলেন "কী সমস্যা?"

মুস্তাক বললেন "আর্মস। ডোনেশন। এ দুটোর প্রচুর ঘাটতি আছে"।

নিয়াজি গুলাম মহম্মদের দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি তো বলছিলে ওরা ইন্ডিয়ায় ঢোকার ব্যাপারে পাকিস্তান আর্মির সাহায্য চায়"।

মুস্তাক বললেন "অপরাধ নেবেন না জনাব। আমরা অবশ্যই কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানকে সাহায্য করার ব্যাপারে সব সময় তৎপর, কিন্তু এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত আর্মস দরকার আমাদের। কাশ্মীরে আমাদের ঘাঁটিগুলোতে টাকা পৌঁছনোরও দরকার আছে। খামোখা কেন লোকগুলো ইন্ডিয়ান আর্মির ওপর পাথর ছুঁড়তে যাবে বলুন?"

নিয়াজি বললেন "আর্মস তোমাদের সরাসরি কী করে দেব?"

মুস্তাক বললেন "জনাব, আমরা সরাসরি চাইছিও না। আমরা অন্যভাবে আর্মস ইমপোর্ট করতে চাইছি। কিন্তু আমাদের এটুকু নিশ্চিত করতে হবে, পাকিস্তান সরকার যেন এই আমদানির সময় উদাসীন হয়ে থাকে। স্টেপ নিতে না যায়"।

নিয়াজি বললেন "কেন? কোত্থেকে আমদানি করতে চাইছ তোমরা আর্মস?"

মুস্তাক একটু থেমে একবার গুলাম মহম্মদ, তারপর নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বললেন "আমাদের মুসলিম ব্রাদারহুড ইরাক থেকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে জনাব। সাপ্লাই লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেলে কাশ্মীর নিয়ে আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না ইনশাল্লাহ"।

নিয়াজি বললেন "বাহ। খুব ভাল বুদ্ধি বের করেছ তো। আমেরিকা জেনে যাক আর তারপর আমাদের টেররিস্ট কান্ট্রি বলে দাগিয়ে দিক। সব রকম গ্রান্ট বন্ধ করে দিক... আর বাকি কী থাকল তাহলে?"

মুস্তাক বললেন "জনাব, আমরা তো পাকিস্তানকে জড়াবোই না এর মধ্যে। তাজাকিস্তান, আফগানিস্তান হয়ে আজাদ কাশ্মীর হয়ে র মেটিরিয়ালস ঢুকবে। বাকিটা আমরা বুঝে নেব"।

নিয়াজি মাথা নাড়লেন "সম্ভব না। আমি কিছুতেই এর পারমিশন দিতে পারি না"।

মুস্তাক বললেন "স্যার আই এস আই চিফ কিন্তু আমাদের সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন"।

নিয়াজি রেগে গেলেন "আই এস আই চিফ ইজ নট দ্য প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান। এ দেশে আমি যা বলব তাই হবে। আমার সিদ্ধান্তই শেষ কথা বলবে"।

মুস্তাক বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন "তা ঠিক জনাব। তবে আমার মনে হয় আই এস আই চিফ না থাকলে আপনি এ জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পেতেন না"।

নিয়াজি গুলাম মহম্মদের দিকে তাকালেন। গুলাম বুঝলেন নিয়াজি অত্যন্ত রেগে গেছেন। বললেন "আমরা এখন বরং ইসলামাবাদে ফিরে যাই জনাব। পরে এই ব্যাপারে কথা বলে নেওয়া যাবে"।

মুস্তাক নিয়াজির দিকে তাকিয়ে বললেন "প্রস্তাবটা বিবেচনা করলে খুশি হব জনাব"।

নিয়াজি উঠলেন। রাগী মুখে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুস্তাক বসে মিটিমিটি হাসতে থাকলেন।

৪৬।

আশরফ কিছুতেই দিল্লি যেতে চাইলেন না। বললেন আগে জম্মুতে রামেশ্বরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন তারপর দিল্লি যাবেন।

রেহান জম্মু অবধি চপারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক হল জম্মু থেকে ফ্লাইটে আশরফকে দিল্লি পাঠানো হবে। চপারে ভোরেই তারা জম্মু পৌঁছলেন।

গোটা রাস্তা আশরফ থমথমে মুখে বসে রইলেন। আর্মি ব্যারাকে রামেশ্বরের মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় মুড়ে রাখা হয়েছে। বীরেন হুইল চেয়ারে করে আশরফকে রামেশ্বরের কাছে নিয়ে গেলেন। আশরফ রামেশ্বরের হাত ছুঁয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

রেহান আশরফকে ধরে অফিসে নিয়ে এসে বসালেন।

আশরফ বললেন "শ্রীনগর হাইজ্যাকিং এর প্রত্যেককে ওরা টার্গেট করছে রেহান"।

বীরেন চুপ করে ছিল।

রেহান বললেন "কারা? কে কে আছে ওদের দলে?"
আশরফ বললেন "তোমার বাড়ির দেওয়ালে কালি লেপে দেওয়া, আমার ওপর অ্যাটাক, ইভেন হাসানের ভাইঝিকে কিডন্যাপিং... এদের মাথা আর যেই হোক, হাসান মাকসুদ কিংবা আফসানা সাইদ হতে পারেন না। দ্য সেল ইজ স্টিল অ্যালাইভ। ভেরি মাচ অ্যালাইভ"।
রেহান বললেন "আমার মাথা কাজ করছে না। আমি... বুঝতেই পারছেন এমনিতেই কাশ্মীর আমাদের মাথাটা দখল করে রেখে দেয়, এর মধ্যে এর সঙ্গে যদি আরও রহস্য যুক্ত হয় তবে বেঁচে থাকব কী করে?"
আশরফ বললেন "আমি বীরেনকে আগেও বলেছি, উই আর ইন এ ওয়ার সিচুয়েশন। সামথিং ইজ গেটিং বিগার ডে বাই ডে আর আমরা সেটা বুঝতেও পারছি না। রেহান"।
রেহান বললেন "বলুন"।
আশরফ বললেন "অল হাউজবোটস নিডস টু বি চেকড ইমিডিয়েটলি। লালচকের প্রতিটা দোকান। আমাকে লাস্ট তিন চারটে ইয়ারের কয়েকটা ডেট বল যেখানে ওদের কাউকে মেরেছি আমরা"।
রেহান বললেন "এক মিনিট, আমি মোবাইলে লিখে রাখি। ওয়েট"।
রেহান মোবাইল বের করলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন "টেনথ সেপ্টেম্বর লাস্ট ইয়ার, আলি মাসুদকে মারা হয় লালচকে। এর দুদিন পরে, টুয়েলভথে, উলার লেক দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল হাসান রেজা, ওখানেই স্পট করে দেওয়া হয়। টুয়েন্টি ফার্স্ট সেপ্টেম্বর আলতাফ..."
রেহান আশরফের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। আশরফ বললেন "তুষার স্যারকে ফোন কর। ইমিডিয়েটলি"।
রেহান ফোন বের করে তুষারের নম্বর ডায়াল করলেন। বেশ কয়েকটা রিঙের পর ধরলেন তুষার, "বল রেহান, জম্মু পৌঁছেছ?"
রেহান আশরফকে ফোনটা দিয়েছিলেন। আশরফ বললেন "স্যার আমি আশরফ বলছি"।
তুষার বললেন "সে কী! তুমি কথা বলছ কী করে? তোমার তো এখন বেড রেস্ট হওয়া উচিত"!
আশরফ বললেন "স্যার, আপনার আলতাফ হুসেনের কথা মনে আছে? দ্যাট জামাত উল মুজাহিদিন লিডার, যাকে আমরা বাতালিক সেক্টরে মেরেছিলাম?"
তুষার বললেন "ওকে মনে থাকবে না? দ্যাট বম্ব স্পেশালিস্ট!"

আশরফ বললেন "স্যার, আলতাফ হুসেনের বাড়ি বাংলাদেশের যশোরে। ইন্ডিয়ান বর্ডারের কাছেই। পীযূষ যদি নাম্বারটা ট্রেস করেই থাকে তবে নিশ্চয়ই কো অরডিনেটসও পেয়ে গেছে। আই থিংক দ্যাট গার্ল ইজ ইন ডেঞ্জার স্যার। উই শুড টেক ইমিডিয়েট অ্যাকশন"।

তুষার বললেন "সবই তো বুঝতে পারছি আশরফ, কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা। কী করব বল? মিনিস্ট্রি থেকে কোন রকম গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না"।

আশরফ অধৈর্য গলায় বললেন "স্যার, দ্য স্লিপার সেল ইজ স্টিল অ্যাক্টিভ। উই নিড টু ক্যাপচার দেম অ্যালাইভ। আমার মনে হচ্ছে ওরা আরও বড় কোন কিছু প্ল্যান করছে। হাসান কি কিছুই কনফেস করেন নি?"

তুষার বিষাদমাখা গলায় বললেন "ইলেকট্রিক শক দিয়ে জানোয়ারটার রক্ত বের করে দিয়েছি চোখ মুখ দিয়ে। যন্ত্রণা সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করছে না। আজ ওর ওয়াইফকে আনা হবে একই সেলে। সমস্যা হল, এই ধরণের জান্তব ইন্টারোগেশন আমি মন থেকে সাপোর্ট করতে পারি না"।

আশরফ বললেন "প্রয়োজন নেই স্যার। আগে মেয়েটাকে যারা আটকে রেখেছে তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরার ব্যবস্থা করুন। আপনি বলুন, আমি কোলকাতা চলে যাচ্ছি। গভর্নমেন্ট, মিনিস্ট্রি যায়ে তাড় মে স্যার। বি এস এফ এবং বি ডি আর চিফের সঙ্গে কথা বলুন। এখন কো অর্ডিনেটস পেয়েছেন, এর পরে না পাওয়া গেলে আরও বড় সমস্যা হবে। মেয়েটাকে ওরা সরিয়ে দিতে পারে কিংবা আরবে বিক্রি পর্যন্ত করে দিতে পারে। সব থেকে বড় কথা আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে আলতাফের বাড়িতেই হাসানের ভাইঝিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে"।

তুষার একটু থমকে বললেন "তুমি রেস্ট নাও। আমি দেখছি। সাবধানে দিল্লি ফেরো। তোমার বাড়িতে জানানো হয়েছে। আমি দেখছি এদিকটা"।

আশরফ বললেন "স্যার প্লিজ আমায় পারমিশন দিন, আমি কোলকাতা যেতে চাই"।

তুষার বললেন "পাগল হয়ে গেছ নাকি? এই শরীরে এত ধকল নিতে পারবে না তুমি"।

আশরফ বললেন "পারব স্যার। আমাকে দরকার হবে আপনার। আমার জন্য না হয় অফিসে একটা লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের ব্যবস্থা করবেন, পারবেন না?"

তুষার হতাশ গলায় বললেন "ইউ আর ইম্পসিবল খান। ওকে, তুমি এসো। রেহান শ্রীনগরে ফিরে যাক। বীরেন থাকুক তোমার সঙ্গে। দাও রেহানকে ফোনটা দাও"।

৪৭।

রাতটা মিনির প্রবল আতঙ্কের মধ্যে কাটল। নাজিব পাশে এসে শুল। মেঝেতে মোতালেব। সারাটা রাত সিঁটিয়ে খাটের এক কোণে বসে ছিল সে।

নাজিব মাঝরাতে বাথরুম গেল। ফিরে এসে তার কান, গলা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। মিনি পাথর হয়ে বসে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে নাজিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল।

ভোর হতেই মিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির বাইরের বসার জায়গায় গিয়ে বসল। মোতালেব উঠে তার পেছন পেছন এসেছিল। খুরপি দিয়ে আবার মাটি খুড়তে শুরু করল।

বাড়িটা বিরাট বড়। দোতলা বাড়ির শুধু নিচের তলাটাই ব্যবহৃত হয়। মিনির কী মনে হল সে বাড়ির ভেতর ঢুকল। মনোয়ারা বেগম এবং নাজিব ঘুমোচ্ছে। মিনি পা টিপে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় গেল।

মোতালেবের মাটি কাটার শব্দ পাচ্ছিল মিনি। তা সত্ত্বেও তার বুক ধড়ফড় করছিল। ওপরটা পুরনো হলেও মানুষের যে যাতায়াত আছে তা বোঝা যাচ্ছিল। সাহস করে একটা ঘরের দরজাতে হালকা ধাক্কা দিল।

দরজা খুলে গেল। সাধারন একটা ঘর। কিছুই নেই তেমন ঘরে।

মিনি চারদিকে তাকিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পরের ঘরে গেল। একই রকম ঘর। কিছুই নেই।

তৃতীয় ঘরের দরজা তালা দেওয়া না থাকলেও ছিটকিনি দিয়ে আটকে রাখা ছিল। অনেক উঁচু দরজা। মিনি চারদিকে তাকিয়ে একটা টুল পেল। সে তড়িঘড়ি টুলটা জোগাড় করে ওটার ওপর দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলল। তার মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডটা খুলে বেরিয়ে চলে যাবে।

এ ঘরটা পরিপাটি করে সাজানো। ঘরের মধ্যে একটা কম্পিউটারও আছে। মিনি একটু অবাক হল। এই পরিবেশে কম্পিউটার।

সে টুলটা ঘরের ভিতরে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে কম্পিউটারটা অন করল।

বুটের পর দেখল ডেস্কটপে নাজিব এবং আরেকজনের ফটো। সে অপরজনকে চিনতে পারল না।

ডেস্কটপে এক গাদা ফোল্ডার। সব ক'টার ভিতরেই উলটো পালটা সব ফাইল। সব কটা ফোল্ডার খুলেও কিছু পেল না। উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় কী মনে হতে ডেস্কটপে একটা পিডিএফ ফাইল ছিল সেটায় ক্লিক করল। দেখা গেল পাসওয়ার্ড চাইছে।

মিনি বিন্দুমাত্র কিছু না ভেবেই পাসওয়ার্ড দিল ব্লুফ্লাওয়ার।

তাকে চমকে দিয়ে পিডিএফটা খুলে গেল।

গোটা ফাইলটা আরবী ভাষায় লেখা। মিনি কিছুই বুঝতে পাল না।

প্রাণপণে ইন্টারনেট কানেকশন খুঁজতে শুরু করল কম্পিউটারের। পেল না।

আরও কয়েকটা ফাইল খুঁজবে ঠিক করেছিল এমন সময় দরজায় ধাক্কানো শুরু হয়ে গেল।

মিনি তড়িঘড়ি কম্পিউটারটা শাট ডাউন করে ঢেকে ঢুকে দিয়ে দরজাটা খুলে দেখল মোতালেব দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। মিনি হাসতে চেষ্টা করল "এমনি, ঘরগুলো ঘুরছিলাম"।

মোতালেব একটা হাত মিনির মুখে দিল, অপর হাতটা কোমরে দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে খাটে শোয়াল। মোতালেবের হাত মিনির মুখ থেকে সরতেই মিনি চেঁচাতে শুরু করল।

মোতালেব চারদিকে তাকাল। টেবিলের ওপরে দড়ি রাখা। সে দড়ি দিয়ে মিনির হাত পা বাঁধল। মুখের মধ্যে একটা কাগজের দলা ঢুকিয়ে দিল। মিনি জোরে চেঁচাতে চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।

মোতালেব এবার দরজা বন্ধ করে মিনির সালোয়ার টান মেরে খুলে দিল। কামিজ ছিঁড়ে দিল। সম্পূর্ণ নগ্ন করে দিল মিনিকে।

মিনির বমি পাচ্ছিল। অসম্ভব মাথা ধরছিল। মোতালেব নিঃস্পৃহভাবে কাজটা করে যাচ্ছিল। মিনির গালে জোরে একটা চড় কষাল। মিনির মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

ব্লিডিং শুরু হয়ে গেছিল তার। খাট ভেসে যাচ্ছিল রক্তে। মিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল।

মোতালেব একটা কাচি নিয়ে এসে মিনির মাথার চুল কেটে দিল ছোট ছোট করে। তারপর আবার চড় মারা শুরু করল।

বেশ খানিকক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। মোতালেব দরজা খুলল। দেখল নাজিব। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাজিব বলল "বাহ, কী সুন্দর দৃশ্য। দাঁড়াও, আমার ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। ছবিটা তুলে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া যাবে। একদিনের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যাবে সব কিছু"।
মিনি কাতরাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে মনোয়ারা বেগম এলেন। তাকে দেখে দাঁতে দাঁত চিপে বললেন "দেখলি তো মাগী? বেশি বাড়লে কী হতে পারে? তোকে অনেক বুঝিয়েছি। আর নয়। এভাবেই থাক তুই, যতদিন না তোর রক্ত পড়া বন্ধ হয়। তারপরে এখানেই মোতালেব তোর খবর নেবে"।
মিনি জ্ঞান হারালো প্রবল আতঙ্কে।

৪৮।
বেনাপোল সীমান্তের বি ডি আর চিফ মিজানুল হক ঘুম থেকে উঠে রোজ একটা গানই শোনেন। "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'। "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি"র জায়গায় প্রতিদিনই তার চোখে জল আসে।
মিজানুল হক চোখ বন্ধ করে সে জল অনুভব করেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে তারপর ইউনিফর্ম পরে টহল দিতে বেরোন।
এই দিনটা ভাল কাটছিল না মিজানুলের। একে বৃষ্টি, তার ওপর প্রচুর লোক হয়ে গেছে। অফিসের বাইরে লাইন দেখে মিজানুল হক সাহেব মুখ বিকৃত করে স্বগতোক্তি করলেন "এত লোক ইন্ডিয়া গিয়া কী করে? লাইন দেখো! থাক না দেশে! দেশটারে গড়তে লাগবে তো! তোরাই যদি সবাই বের হয়ে যাস তাহলে তো দেশটা সেই জামাতের হাতেই চইলা যাইব!"
মিজানুল তার ড্রাইভারকে বললেন "গাড়ি বের করো সাদিক। বর্ডার চক্কর দিয়ে আসি"।
সাধারণত মিজানুল হক একাই বেরোন। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। বর্ডার বরাবর মাটির রাস্তা আছে। বৃষ্টির ফলে সে রাস্তা কাদা ভর্তি হয়ে আছে। সাদিক বলল "স্যার, কতটা যাইবেন?"
মিজানুল বললেন "যতটা যেতে পারো যাও"।
খানিকটা গিয়ে বিডি আরের একটা ক্যাম্পে পৌঁছনো গেল। ক্যাম্পের বাইরে জনা দশেক গরীব লোককে আটক করা হয়েছে। মিজানুল হক গাড়ি থেকে নামতেই ক্যাম্পের ইমতাজ আলি বললেন "স্যার, এই যে, আজকের কালেকশন"।

মিজানুল হক লোকগুলোর দিকে তাকালেন। আটজন পুরুষ, কারও গায়ে সস্তা ছেড়া গেঞ্জি, কারও জামা, সবাই লুঙ্গি পরিহিত, একজন মহিলা, একজন সাত আট বছরের বাচ্চা, সেও লুঙ্গি পরে আছে। চোখে মুখে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। মিজানুল হুঙ্কার দিলেন "এবার যে তোদের জেলে দেব"।
বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করল। মিজানুল বললেন "কাঁদলে হবে না, অপরাধ বোঝ? তোমরা অপরাধ করস। এই যদি ইন্ডিয়ায় ধরা পড়তা তাহলে পেছনে গুলি ভইরা দিত। বুঝছ?"
মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বলল "কী করব স্যার, টেকা নাই ,পয়সা নাই, খাবার ভাত নাই। কোই যামু কন?"
মিজানুল ভারতবর্ষের দিকে তাকালেন। কী চৌম্বকীয় ক্ষমতা আছে দেশটার? আদৌ খেতে দিতে পারে এদের? এভাবে সবাই কেন চলে যায়?
ইমতাজ চেয়ার নিয়ে এসেছিল। মিজানুল চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন, এই সিগারেটটা ইন্ডিয়া থেকেই আনা। প্রায়ই তারা বনগাঁর বাজারে বাজার করতে যান। বি এস এফ চিফ বলবিন্দর সিং এর সঙ্গেও তার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। বর্ডার অঞ্চলে এসব জলভাত ব্যাপার।
সিগারেটে একটা টান দিয়ে মিজানুল বললেন "কী করবা তোমরা ইন্ডিয়ায় গিয়া?"
একজন পুরুষ বলল "মহারাষ্ট্রে নিয়ে যাবে হুজুর। কাম করবে"।
মিজানুল বললেন "যদি খুন কইরা ফেলে। কী করবা?"
মহিলা বলল "করলে করবে। এহানেই বা বাইচ্চা আছি কোই?"
মিজানুল মুগ্ধ হলেন মহিলার কথা শুনে। কত কঠিন কথা কত সহজে বলে দিল মেয়েটা। এই তো তার বাংলাদেশ। দারিদ্র আছে কিন্তু মাথাটা এখনও নিচু করতে শেখে নি।
তিনি ইমতাজকে বললেন "কদিন জেলে রাইখ্যা পাঠায় দাও যেখান থেকে আইসিল সেহানে। আর এই পিচ্চিটা, কী নাম তোর?"
ছেলেটার নাক থেকে সিকনি বেরোচ্ছিল। লুঙ্গিও খুলে যাচ্ছিল। এক হাতে লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে বলল "ভগবান বিশ্বাস"।
মিজানুল মজা পেলেন "নামটা তো জব্বর রাখসে তোর বাপে। কোই তোর বাপ?"
একজন লোক হাত তুলল। মিজানুল বললেন "তুমি হিন্দু?"
লোকটা বলল "হ স্যার"।

মিজানুল বললেন "এদের সঙ্গে তুমিও যাবে?"
লোকটা বলল "পোলাডারে খাওয়াইতে পারি না স্যার। কী করুম কন"।
মিজানুল বললেন "দালালটা কোই?"
দালাল সাগির আহমেদ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। মিজানুল বললেন "এদিকে আয়"।
সাগির ধীর পায়ে মিজানুলের দিকে এগোল। মিজানুল সাগিরের কান ধরে দু গালে দুটো চড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে বললেন "লজ্জা করে না দ্যাশের নাম ডুবাস?"
সাগির কেঁদে ফেলল "আর হইবে না স্যার। সব ছাইড়া দিমু। দ্যাশে ফিইরা চাষ করমু। ছাইড়া দ্যান স্যার"।
মিজানুল বললেন "উঠবস কর। একশোটা"।
সাগির উঠবোস করতে শুরু করল। মিজানুল উঠলেন। পকেট থেকে এক হাজার টাকা বের করে ভগবানের হাতে দিয়ে বললেন "দেশে যা। স্কুলে ভর্তি হ। এটা সবার দেশ। শুধু মোল্লাগো দেশ না। শুধু মোল্লাগো বাড়াবাড়ির লাইগা আমার আব্বু মুক্তিযোদ্ধা লড়ে নাই বুঝছস? আবার যদি দেখসি তালে আমার থেকে খারাপ কেউ হইব না। পড়াশুনা জানিস?"
ভগবান বলতে শুরু করল "অ আ ই ঈ..."
মিজানুল বললেন "থাক থাক। অনেক হয়েছে। ইমতাজ এদের দেশে ফেরত পাঠাও। ভগবানকে স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কর। যা টাকা লাগে আমি দেখব"।
ইমতাজ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বলতে পারল না। মিজানুল হক আবেগপ্রবণ মানুষ। কখন কী করবেন কেউ জানে না।
মিজানুল ভগবানের মাথায় হাত বুলিয়ে গাড়িতে উঠলেন। সাদিককে বললেন "অফিসের দিকে চলো"।
সাদিক গাড়ি স্টার্ট দিল। মিজানুলের ফোন বেজে উঠল।
মিজানুল দেখলেন ভারতীয় নম্বর। ভ্রু কুঁচকাল তার। ধরলেন "হ্যালো"।
"হক সাহেব বলছেন?"
"বলছি"।
"স্যার আমি পীযূষ বলছি। গত শীতে ঢাকা গেছিলাম আপনি অনেক হেল্প করেছিলেন চেকিংএর সময়"।
"মনে আছে। মনে আছে। বলুন"।
"স্যার, আমার বস আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান"।
"আচ্ছা, দিন"।

ওপাশ থেকে তুষার রঙ্গনাথনের গলা ভেসে এল "গুড মর্নিং সাহেব"।
"গুড মর্নিং। কে বলছেন?"
"আমি ডি আই বি চিফ বলছি সাহেব। একটা খুব বড় বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করছি। আপনি ছাড়া কিছুতেই এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব না"।
মিজানুল হক অবাক হলেন। ইন্ডিয়ার এত বড় অফিসার এভাবে কথা বলছেন? বললেন "বলুন। কী সাহায্য করতে পারি আমি আপনাকে?"

৪৯।

নিয়াজি ইসলামাবাদে নামলেন দুপুর নাগাদ। লিমুজিনে উঠে গুলাম মহম্মদকে বললেন "আই ওয়ান্ট টু নো গুলাম, হোয়াট সরফরাজ ইজ ডুয়িং। আই এস আইকে মনে রাখতে হবে সে আর নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এনটিটি। আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে হোয়াটেভার সে ডু। আমাকে একটা তিন টাকার জঙ্গীর কাছ থেকে শুনতে হবে সরফরাজ খান আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছে? হাউ ডেয়ার হিম!"
গুলাম বুঝলেন নিয়াজী অত্যন্ত রেগে আছেন। বললেন "জনাব আপ প্লিজ নারাজ মত হইয়ে। আজ রাতেই সরফরাজ খানকে ডেকে নিন। আমরা কথা বলি সামনা সামনি"।
নিয়াজি বললেন "আমার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল জামাল পাশার মার্ডারের পিছনে সরফরাজ খানের হাত আছে। ও একজন পাপেট প্রেসিডেন্ট চাইছে যে ওর সব কথা শুনবে। আগে ভাবছিলাম শুধু সরফরাজ একাই সব কিছু করছে, এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এর পিছনে একমাত্র সরফরাজ নেই। একটা..."
গুলাম বললেন "বুঝতে পারছি জনাব। কিন্তু আমাদের ঘাবড়ালে চলবে না। পাকিস্তানি আর্মি মোটেও দুর্বল নয় এটা সবার জানা দরকার। আমরা যত রকমভাবে এদের উত্থানকে আটকাবো। তার জন্য জিস হদ তক জানা পড়ে হাম জায়েঙ্গে জনাব"।
নিয়াজি তবু ফুঁসছিলেন।
গুলাম বললেন "জনাব প্লিজ। অতিরিক্ত রেগে গিয়ে কোন ডিসিশন নিলে সেটা আপনার এবং এই দেশের, দুইয়ের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে। প্লিজ টেক ইওর টাইম। আমরা আরেকটু সময় নি"।
নিয়াজি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

কনভয় ফাতিমা জিন্নাহ পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নিয়াজি দেখলেন কয়েকজন কিশোর পার্কের সবুজ ঘাসে ক্রিকেট খেলছে।
নিয়াজি বললেন "গাড়ি থামাও"।
গুলাম বললেন "কী জনাব, গাড়ি থামাবে কেন? মিটিং আছে তো"।
নিয়াজি বললেন "নাহ। মন মেজাজ ঠিক নেই। আমি ব্যাটিং করব"।
গুলাম কনভয় থামানোর নির্দেশ দিলেন।
নিয়াজি আর্মি ইউনিফর্ম পরে ছিলেন। গাড়ি থেকে নামলেন। গুলামকে বললেন "তুমি এখানেই থাকো। দেখ কেমন ব্যাট করি"।
তার নিরাপত্তারক্ষীরা নামতে যাচ্ছিল। নিয়াজি তাদেরও নিরস্ত করলেন।
যে কিশোররা ক্রিকেট খেলছিল, নিয়াজি এগিয়ে গিয়ে হেসে বললেন "মে আই ব্যাট?"
যে ছেলেটা ব্যাট করছিল সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না স্বয়ং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার কাছে ব্যাট চাইছেন। সে চোখ বড় বড় করে নিয়াজির দিকে তাকাল।
একজন নিরাপত্তারক্ষী ছেলেটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল নিয়াজি হাত তুলে তাকে আসতে বারণ করলেন। ছেলেটাকে বললেন "তোমার নাম কী?"
ছেলেটা বলল "শাহিদ জনাব"।
নিয়াজি বললেন "আমাকে একটু ব্যাট করতে দেবে?"
শাহিদ বলল "জরুর জনাব, জরুর"।
নিয়াজি ব্যাট হাতে নিলেন। এককালে প্রচুর ক্রিকেট খেলতেন। অভ্যস্ত হাতে স্টান্স নিচ্ছিলেন এমন সময় চারদিক কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ হল। শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিয়াজি মাটিতে শুয়ে পড়লেন।
বিস্ফারিত চোখে দেখলেন তার গাড়িটায় বিস্ফোরণ হয়েছে। আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। পার্কে যারা খেলছিল তাদের মধ্যে একজন ঘাসেই পড়ে গেল। সম্ভবত গাড়ির কোন কিছু ছিটকে এসে তার গায়ে লেগেছে। বাকিরা প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে।
চতুর্দিক একটু শান্ত হলে নিয়াজি উঠলেন। দৌড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দেখলেন গুলাম মহম্মদ মরে পড়ে আছেন। চোখ মুখ বিকৃত। চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সামনের কনভয়ের দুটো গাড়ি অক্ষত ছিল। যে কজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল সে গাড়িতে তারা দৌড়ে এসে নিয়াজিকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

নিয়াজি ঘামছিলেন মারাত্মকভাবে। একজন নিরাপত্তারক্ষীকে বললেন "ক্যান্টনমেন্টে চল। প্রেসিডেন্ট হাউজে না"।
কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ক্যান্টনমেন্টের কোয়ার্টারে পৌঁছলেন নিয়াজি।
নিজের ঘরে গিয়ে ইউনিফর্ম খুলে নিজের বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইলেন।
কিছুক্ষণ পর ফোন বের করে গম্ভীর মুখে একটা নম্বর ডায়াল করতে শুরু করলেন।

৫০।
পেশোয়ার।
ঘুম থেকে উঠে সায়ক কোথাও বেরোয় নি। অলসভাবে কাটছে দিনটা।
টিভি দেখছিল আব্বাসের সঙ্গে। আব্বাস খেলা দেখতে ভালোবাসে। পাকিস্তানের প্রিমিয়ার লীগ দেখছিল। খেলা দেখতে দেখতে বলল "যাই বল মিয়াঁ, পাকিস্তানের পেসারগুলো খাসা"।
সায়ক বলল "হু"।
আব্বাস বলল "তবে আমাদের কোহলির সামনে সব ছুঁচো হয়ে যাবে, কী বল?"
সায়ক বলল "হু"।
আব্বাস বিরক্ত হয়ে বলল "কী সারাক্ষণ হু হু করে যাচ্ছ? ক্রিকেটমে কোই খাস দিলচস্পি নেহি হ্যায় ক্যা?"
সায়ক বলল "নাহ। বেঙ্গলের হয়ে একবার শুধু রঞ্জি খেলেছিলাম"।
আব্বাস অবাক হয়ে বলল "অ্যা? সিরিয়াসলি?"
সায়ক আব্বাসের কথার উত্তর না দিয়ে বলল "দয়া করে একটু নিউজ চ্যানেলটা দেবে? সকাল থেকে এই ভাটের ফিক্সড লিগ দেখে মাথা পচে গেল"।
আব্বাস রিমোটটা সায়কের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল "দাও, নিজেই দেখো। পাকিস্তানের আবার নিউজ চ্যানেল! সারাক্ষণ ইন্ডিয়ার এগেইন্সটে বলে যাচ্ছে! দেখো কী করে? আমার তো গা জ্বলে যায়"।
সায়ক বলল "গা জ্বললে হবে কী করে? এদেশে জাসুসি করলে পাকিস্তানিই হয়ে যেতে হবে মিয়াঁ বুঝেছ?" সায়ক চ্যানেল চেঞ্জ করে নিউজ চ্যানেল দিল।
খবরে দেখাচ্ছে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট নিয়াজীর ওপরে "জান লেবা" হামলা হয়েছে, অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন প্রেসিডেন্ট। সায়ক তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বলল "শিট!"

আব্বাস বলল "এ তো রোজকার ঘটনা মির্যা। এতে এতো লাফালাফি করার কী আছে?"

সায়ক বলল "তুমি বুঝতে পারছ না আব্বাস! জামাল পাশাকে মারল, আজকে নিয়াজিও টাপেটি হয়ে গেলেন। এর মানেই হচ্ছে দেশ চালানোর হাল এখন পাকিস্তানের আর্মির হাতেও নেই"।

সায়ক কম্পিউটারে বসল। তুষারকে ফোন করার চেষ্টা করল বার তিনেক। তিনবারই ব্যর্থ হল। বলল "কী যে হল! কিছুতেই তুষার স্যারকে ফোন পাচ্ছি না! কী করা যায় বল তো?"

আব্বাস বলল "কী করবে? খবর দেখো। পরে পেয়ে যাবে ঠিক"।

সায়ক অস্থির ভাবে বলল "না না, তুমি বুঝতে পারছ না, কালকেই ফারুক চাচার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সামথিং ইজ কুকিং... সামথিং ডেঞ্জারাস ইজ অ্যাবাউট টু হ্যাপেন"।

আব্বাস অবাক হয়ে বলল "কী হ্যাপেন? কী যে বলছ? কিছুই মাথায় ঢুকছে না"।

সায়ক ঘর থেকে বেরোতে গেল। আব্বাস ডাকল "ও মির্যা, কী কর, ফারুক চাচা বেরোতে বারণ করেছে তো"।

সায়ক একটা চেয়ারে জোরে লাথি মেরে বলল "শিট, শিট, শিট! দিস ইজ রিয়েল শিট! দেখি আবার"।

আবার তুষারকে ফোন করার চেষ্টা করল সায়ক। পাওয়া গেল না।

দরজা খুলে ফারুক ঢুকলেন। সায়ক যেন হাতে চাঁদ পেল। বলল "চাচা, খবরটা শুনেছ?"

ফারুক বললেন "শুনেছি, তবে তার থেকেও তোমার জন্য বড় খবর আছে। সরফরাজ খান পেশোয়ারে ঢুকেছে"।

সায়ক লাফিয়ে উঠল, "ইয়েস! গাড়ির ব্যবস্থা করুন চাচা"।

ফারুক বললেন "হয়ে গেছে। গলির মুখে আনবীর দাঁড়িয়ে আছে। তবে শোন, আবার বলে দিচ্ছি, তুমি কিন্তু কোনভাবেই ওই বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করবে না"।

সায়ক বলল "ক্ষেপেছেন? আমার কোন দরকারই নেই। আমি এবার আমার আরেকটা শখ পুরো করব"।

আব্বাস বলল "কী?"

সায়ক দেওয়াল থেকে ডি এস এল আর আর একটা টেলি লেন্স নিয়ে বলল "লাইফ ইজ অ্যামেজিং আকাশ। লেটস গো"।

#

কাশেম সোলেমানির ডেরা থেকে প্রায় দুশো মিটার দূরে গাড়িটা দাঁড় করালো সায়ক।

আকাশ বলল "হয়ে গেল? এখানেই?"

সায়ক বলল "গাড়িতেই বসে থাকো। আমি আসছি একটু পরেই"।

আকাশ অবাক হয়ে বলল "খেপে গেছ? পাগলা গয়ে হো ক্যা? একা একা যাবে? না না তা হবে না, আমিও যাব"।

চারদিকে রুক্ষ প্রান্তর। মাঝে মাঝে ঘাসের বড় বড় ঝোপ। সায়ক যতটা পারল এগোনোর চেষ্টা করল। বাড়িটার ভেতরে জুম করার চেষ্টা করল ক্যামেরা দিয়ে। বড় বড় দেওয়াল। কিছুই দেখা গেল না। একটু একটু করে অনেক খানি এগিয়ে গেল সায়ক।

খানিকক্ষণ পরেই একটা কলাভয় বাড়িটার সামনে এল। সায়ক পর পর বেশ কয়েকটা ছবি তুলল। গাড়ির ভেতর সরফরাজ খানকে দেখা যাচ্ছে। সায়ক অস্ফুটে বলল "ইয়েস। ইয়েস। কাম হো গয়া"।

কথাটা শেষ হল না ঘাড়ে বন্দুকের শীতল স্পর্শ পেল সায়ক, অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন পাঠান তার হাতের একে ৪৭ নিয়ে তার দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

সায়ক বলল "জাস্ট ফটোগ্রাফি ফ্রেন্ড। জাস্ট ফটোগ্রাফি"।

পাঠান বন্দুক দিয়ে সায়ককে গুঁতো দিল, "চল, আন্দর চল। ফটো লেনে কা শখ হ্যায় না তুঝে? আন্দর চল কর লেনা"।

সায়ক কিছু বলার আগেই একটা উড়ন্ত ইট এসে পাঠানের মাথার পেছনে লাগল। পাঠান একবার সায়কের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে মাটিতে কাটা পাঁঠার মত শুয়ে পড়ল। সায়ক দেখল আকাশ এসে পড়েছে। তার দিকে দাঁত বের করে তাকিয়ে বলল "তুমি মিয়াঁ রঞ্জি খেলেছ, আর আমি পাড়ার মাঠের ক্রিকেটের বেস্ট ফিল্ডার ছিলাম। হল প্রমাণ?"

সায়ক হেসে ফেলল।

৫১।

মিনি শুয়ে ছিল খাটে। তার চোখের তলায় কালশিটে পড়ে গেছে। ধর্ষণ না হলেও সারারাত মোতালেব মির্যা মেঝেতে বসে ছিল। যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন চড় মেরেছে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছে সে। বিছানা ভর্তি রক্ত, পেচ্ছাপ। একবারও পরিষ্কার করে নি কেউ।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙেছে তার। উঠে দেখল মোতালেব মাছের মত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে আতঙ্কে আবার চোখ বুজে ফেলল।

কিছুক্ষণ পর বলল "আমার গায়ে একটা কাপড় দিন প্লিজ। আপনার বাড়িতে যদি মা বোন কেউ থাকত, তাহলে আপনি পারতেন এভাবে তাকে মারতে?"

মোতালেব কিছু বলল না। একই ভাবে বসে থাকল। মনোয়ারা বেগম কিছুক্ষণ পরে এসে একটা গামছা ফেলে দিলেন মিনির গায়ে। মোতালেবকে বললেন "একে আজ খেতে দিবি না। শুয়ে থাক এভাবেই"।

সারাদিন মোতালেব বসে থাকল তার পাশে। একবার বাথরুমে নিয়ে গিয়ে আবার একইভাবে বেঁধে শুইয়ে দিল। মিনি আটকাবার কথা ভাবতেও পারল না।

দুপুরের দিকে নাজিব এল। তার গায়ের গামছাটা সরিয়ে গোটা শরীরে হাত বোলাতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর মোতালেবকে বলল "যা তো, মার কাছ থেকে গুড় নিয়ে আয়। এ মেয়ের শরীরে গুড় মাখিয়ে দি। কিছুক্ষণ পর গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ে আসবে, আরও মজা হবে"।

মোতালেব নিচে চলে গেল।

নাজিব মিনির গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল "আর তো খুব বেশি হলে একটা দিন। তারপর দেখ তোর কী হাল করি"।

মিনির মুখ দিয়ে বমি উঠে গেল। নাজিব মিনির পেটে মাথা পেতে শুল, বলল "পেট খারাপ হয়েছে সোনার? দেখি দেখি, পেট থেকে কেমন গুড়গুড় শব্দ আসে! আর এ কী রক্ত! দেখি, পরিষ্কার করে দি"।

মিনি চেঁচিয়ে উঠল "প্লিজ এখন ছেড়ে দিন আমায়, প্লিজ"।

নাজিব আদুরে গলায় বলল "দেব তো সোনা। তুমি তো আমার বউ। সকাল বিকাল তোমায় আনন্দ দেওয়া আমার কর্তব্য। দেখি দেখি বুক দুখানি দেখি"।

নাজিব হাত বাড়াল। মিনি চেঁচাতে গেল, নাজিব মিনির মুখের মধ্যে হাত দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল "চিল্লিয়ে কোন লাভ নেই, কেউ শুনতে পাবে না। উফ,

মোতালেব গুড় আনতে গিয়ে কোথায় চলে গেল? দাঁড়া, আমি আসছি, এখনই আসছি"।

খানিকক্ষণ পর নাজিব গুড় নিয়ে আসল। মিনির সারা শরীরে মাখাতে মাখাতে বলল "ভাল লাগছে না মাগী? আরও ভাল লাগবে। দেখ দেখ কেমন আনন্দ পাচ্ছিস আমি যখন তোকে গুড় মাখিয়ে দিচ্ছি"।

মিনি ককিয়ে উঠল। ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। মোতালেব এসে মিনিকে সপাটে একটা চড় কষাল। নাজিব হাসতে হাসতে বললে "মাগীর কিন্তু ভাল্লাগসে। বলে না, বুঝছিস?"

মিনি গোঙাতে গোঙাতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

নাজিব মোতালেবকে বলল "চ, নিচে যাই। মাগী পড়ে থাক এভাবেই। দরজাটা বন্ধ করে দে"।

#

রাত এগারোটা। নাজিব, মনোয়ারা বেগম খেতে বসেছিল। মোতালেব মাটিতে বসে খাচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ছিল বলে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ হয়েছে। নাজিব ইলিশের কাঁটা বাছছিল মন দিয়ে। মনোয়ারা একটা ইলিশের পিস নাজিবের প্লেটে দিলেন।

নাজিব আপত্তি করল "না না দিও না, কী যে কর না"।

মনোয়ারা আদুরে গলায় বললেন " খা না বাবা, আরেকটু খিচুড়ি দেব?"

নাজিব মাথা নাড়ল "না না। থাক থাক। আর লাগবে না"।

মনোয়ারা উঠে গিয়ে মোতালেবকে খিচুড়ি দিয়ে আবার খেতে বসলেন। সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশ। কে বলবে বাড়িতে একটা মেয়ের ওপর ওভাবে অত্যাচার চলছে। দরজায় কেউ বেল দিল। মনোয়ারা বিরক্ত গলায় বললেন "কে এল আবার"?

নাজিব বলল "সুলতানভাই মনে হয়। কালকে আসার কথা ছিল তো। আজ এসে গেছে হয়ত। কোন খবরও দেয় নি। মোতালেব দেখ তো গিয়ে"।

মোতালেব উঠল। দরজা খুলল।

তারা কিছু বুঝে ওঠার পাঁচজন ভারতীয় এন এস জি কমান্ডো এবং সাতজন বিডি আর কমান্ডো ঢুকল। মোতালেব একজন কমান্ডোকে এঁটো হাতেই ঘুষি মারল। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে বেশ কয়েকটা গুলি ঝাঁঝরা করে দিল তাকে। মোতালেব ওখানেই পড়ে গেল। নাজিব হাত তুলল, "সারেন্ডার, সারেন্ডার"।

মিজানুল হক ঘরে ঢুকলেন। নাজিবকে বললেন "মেয়েটা কোথায়?"

নাজিব উত্তর দিল না।

মিজানুল হক এগিয়ে সরাসরি নাজিবের নাকে ছুরি মারলেন "কল মেয়েটা কোথায়?"

নাজিব ককিয়ে উঠল, "উপরে আছে। উপরে"।

মিজানুল বললেন "সিঁড়িটা কোনদিকে?"

নাজিব হাত দিয়ে দেখাল।

মিজানুল বললেন "তিনজন এদের দিকে নজর রাখো। বাকিরা আমার সঙ্গে এসো"।

মিজানুল দ্রুত উপরে উঠলেন। সব ঘরের দরজা ধাক্কিয়ে অবশেষে মিনিকে দেখলেন। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় শুয়ে আছে। খাট ভর্তি মল মূত্র। গায়ে পিঁপড়ে ভর্তি।

মিজানুলের নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল অজান্তেই।

৫২।

বাইরে প্রেসের লোক ভর্তি হয়ে আছে।

সবাই তার কথা শোনার জন্য বসে।

নিয়াজির দম বন্ধ হয়ে আসছিল। নিজে ইন্ডিয়া পাকিস্তান কার্গিল যুদ্ধের সময় বর্ডারে ছিলেন, ইন্ডিয়ান সেনাদের গুলিতে নিজের পাশের যোদ্ধাকে চোখের সামনে শহীদ হয়ে যেতে দেখেছেন। কিন্তু নিজের দেশে, নিজের চোখের সামনে গুলাম মহম্মদের মৃত্যুটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। বারবার মনে হচ্ছিল, ক্রিকেট খেলতে না নামলে তারও একই দশা হত।

ফোন বাজছিল তার। নিয়াজি দেখলেন হোয়াইট হাউজ থেকে ফোন এসেছে।

ধরলেন না। কয়েক মিনিট বসে থেকে ঘর থেকে বেরলেন।

বাইরে একটা টেবিলে একগাদা মাইক রাখা। অন্য সময় হলে গুলম মহম্মদকে বলতেন সিকিউরিটি চেকিঙের জন্য। এবারে একেবারেই উদাসীন মুখে বসলেন।

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল চতুর্দিক থেকে। প্রশ্ন ভেসে এল "স্যার, আর ইউ ওকে"?

নিয়াজি তাকালেন প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে, ঠান্ডা গলায় বললেন "অ্যাবসোলিউটলি"।

"আপনার কার ওপর সন্দেহ হচ্ছে এই ঘটনাটার জন্য"?

"এই মুহূর্তে বলা যাবে না। তবে র এই মুহূর্তে পাকিস্তানে অতি সক্রিয় সে খবরটা আমি ক'দিন ধরেই পাচ্ছিলাম"।

বিবিসের সাংবাদিক সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন "তারমানে আপনি এই ঘটনাটার জন্য ইন্ডিয়াকে সন্দেহ করছেন?"

নিয়াজি একটু থমকে বললেন "আপাতত। কোন কংক্রিট ডেটা নেই এই মুহূর্তে আমার হাতে"।

"প্রথমে জামাল পাশা, তারপরে আপনি। আপনার কি মনে হচ্ছে না পাকিস্তানে অ্যানার্কি স্থাপনের লক্ষ্যে এই ব্লাস্টগুলো হচ্ছে?"

নিয়াজি বললেন "হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তানে সমস্যা তৈরী হলে কিছু দেশ তো স্বাভাবিকভাবে লাভবান হবেই"।

একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক বললেন "স্যার, এই মুহূর্তে আপনি কাকে নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করছেন?"

নিয়াজি সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমাদের সবার একজনই পরম বন্ধু আছেন। পরম করুণাময় আল্লাহপাক। আমি জানি উনি ঠিকই আমাকে পথ দেখাবেন দেশের এই সঙ্কটে। আমি নিজেকে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কেয়ারটেকার বলে মনে করি। এই অ্যাক্সিডেন্টের ফলে বোঝাই যাচ্ছে কেউ আমাকে পথ থেকে সরাতে চাইছে যাতে পাকিস্তানে সমস্যা তৈরী করা যায়"।

"স্যার বিরোধী শিবির বলছে গুলাম মহম্মদকে মারার জন্য এটা আপনারই চক্রান্ত ছিল"।

নিয়াজি গলাটা চিনলেন না। ক্লাশের কলকাকলিতে প্রশ্নটা কে করল বুঝতে পারলেন না। বললেন "কে প্রশ্নটা করলেন? দেখি মুখটা?"

কেউ হাত তুলল না। নিয়াজি বললেন "সাংবাদিক হয়েছেন বলে যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতে পারেন না। আপনাদের কোন ধারণা নেই ওই গাড়িতে আমি যাচ্ছিলাম। যে টাইম বোমটা বিস্ফোরণ হয়েছে, আমার পক্ষে কোনমতেই জানা সম্ভব নয় কোন সময়ে সেটা ব্লাস্ট করবে। তাছাড়া গুলাম মহম্মদ আমার সব থেকে প্রিয় সহচর ছিলেন। তার মৃত্যুকে আমি কোনমতেই মেনে নিতে পারছি না। আশা করব, এইসব বেহুদা সওয়াল করে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আর কোন প্রশ্ন আছে কারও?"

"স্যার এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ার অভিযোগ আছে, ইন্ডিয়াতে ঘটে যাওয়া পর পর হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানের হাত রয়েছে। ওরা কাশ্মীরের ঝামেলার জন্যও পাকিস্তানকে দায়ী করছে। ইন্ডিয়া স্পেসিফিক্যালি অভিযোগ করেছে ইসলামিক স্টেট পাকিস্তানকে ওদের টেরোরিজমের ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করছে আর

আপনার তাদের পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছেন। এই মারাত্মক অভিযোগ সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?"

নিয়াজি বললেন "সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পাকিস্তান কোন দিনও টেরোরিজমকে প্রশ্রয় দেয় না"।

"কিন্তু স্যার আজাদ কাশ্মীরে লস্কর কিংবা হিজবুলের ঘাটিগুলো সম্পর্কে আপনারা কিছু বলতে চান না কেন?" সি এন এনের বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

নিয়াজি বললেন "লস্কর কিংবা হিজবুল প্রসঙ্গে পাকিস্তান বরাবরই বিরোধিতা করে এসেছে। আপনারা ঠিক ঠাক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করলে দেখতে পাবেন পকিস্তান নিজেই অনেকবার লস্করের ঘাটি ভাঙতে সাহায্য করেছে। সমস্যা হল আজাদ কাশ্মীরে আমাদের সরাসরি হাত নেই"।

একজন সাংবাদিক একটা ছবি বের করে তুলে ধরল "স্যার, আমাদের কাছে এই ছবিটা মেইল করা হয়েছে এক অজানা সোর্স থেকে। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে আপনি মুস্তাক জিমরির সঙ্গে মিটিঙে ব্যস্ত। এই ছবিটা কি সত্যি? আপনি কি আজ মুস্তাক জিমরির সঙ্গে মিটিং করতে মুজফফরাবাদে গেছিলেন?"

নিয়াজি সাংবাদিকটিকে চিনলেন না, বললেন "আপনারা ফটোশপড ছবি কি বুঝতে পারেন না? প্লিজ এইসব ছবি নিয়ে অযথা ঝামেলা তৈরী করবেন না"।

নিয়াজি উঠে পড়লেন। একজন বললেন "স্যার, আপনি প্রেসিডেন্ট হাউজে ফিরবেন না?"

নিয়াজি বললেন "না, আপাতত আমি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। আজ এখানেই থাকব"।

"আপনার কি মনে হয় না দেশের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তাহলে গোটা দেশের মানুষ কী করবেন?"

নিয়াজি প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসলেন।

৫৩।

গাড়িতে উঠে আব্বাস হাঁফাচ্ছিল। তানবীর কোন কথা জিজ্ঞেস না করেই গাড়ি স্টার্ট দিল।

সায়ক বলল "জোরে নিঃশ্বাস নাও। এত ভয় পাওয়ার কিছু হয় নি"।

আব্বাস বলল "কী যে বল মিয়াঁ, যদি অন্য কেউ আমাদের দেখে থাকে?"

সায়ক বলল "দেখলে দেখবে, কী আর হবে?"

আব্বাস বলল "সে কী? যদি গুলি টুলি চালিয়ে দেয়?"

সায়ক বলল "দিলে দিত, কথাই আছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন"।

আব্বাস বলল "থাক বস, অনেক হয়েছে। এবার ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে বাঁচি"।

সায়ক কিছু বলল না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রুক্ষ প্রান্তর। এখান থেকে আফগানিস্তান বর্ডার একেবারেই কাছে। বেশিরভাগ জায়গাই দখল করে নিয়েছে আফগান উদ্বাস্তুরা। ছোট ছোট বস্তি হয়েছে। জলের প্রচন্ড অভাব এ অঞ্চলে। তবু তালিবান এবং আমেরিকানদের মুহুর্মুহু সংঘর্ষ থেকে বাঁচতে অনেকেই এপারে শরণার্থী হয়েছে।

সায়ক বাইরে তাকিয়ে বলল "মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছে, অথচ এরা বন্দুকের ভাষা থেকে বেরোতে পারল না"।

আব্বাস বলল "ইন্ডিয়ায় বসে কেউ ভাবতেও পারবে না ঠিক কী পরিবেশে এখানকার মানুষেরা থাকে। আর আমাদের চ্যালেঞ্জটা বোধ হয় এটাই। ইন্ডিয়া যেন কোন দিন পাকিস্তান, আফগানিস্তান না হয়ে যায়"।

সায়ক বলল "ইন্ডিয়া চেষ্টা করছে সব রকমভাবে এরকম হবার। যে কোন দিন হয়ে যেতে পারে। দেশের পরিস্থিতিও কি খুব একটা ভাল ভেবেছ?"

আব্বাস মুখ কালো করে বসে রইল।

পেশোয়ার শহরে প্রবেশের আগে বিরাট জ্যাম।

সায়ক অবাক হয়ে তানবীরকে বলল "কী হল আবার?"

তানবীর গাড়ি থেকে নেমে বাইরে ঘুরে এসে বলল "আর্মির সঙ্গে আফগান রিফিউজিদের ঝামেলা লেগেছে। দু চারটে দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে আফগানরা। এখনও ঝামেলা চলছে"।

কথাটা তানবীর এমনভাবে বলল যেন এতো রোজকার ঘটনা, এত চাপ নেবার কী আছে?

আব্বাস ভিতু গলায় সায়ককে বলল "এবার কী হবে? আর্মি যদি আমাদের চেক করে? তোমার ক্যামেরা আছে মিয়াঁ"।

সায়ক একটা হাই তুলে বলল "চেক করলে করবে, কী আর হবে? খুব বেশি হলে গুলি করে মারবে!"

আব্বাস চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে বলল "আপ আদমি হো ইয়া পাজামা? কমসে ইতনা কুল রহতে হো মিয়াঁ?"
সায়ক চোখ বুজল "সকাল থেকে অনেক পরিশ্রম গেছে। আমি চোখ বুজলাম। পৌঁছলে ডেকে দিও"।
আব্বাস বিড়বিড় করতে লাগল "আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে"।
বাইরে বাস্তবিকই হুলস্থূল লেগে গেছে। আর্মি যথেচ্ছভাবে লাঠি পেটা করছে। বিক্ষোভকারী আন্দোলনরা যে যেদিকে পেরেছে দৌড়ে পালাচ্ছে।
এর মধ্যেই গাড়ি শম্বুক গতিতে এগোতে থাকল।
আব্বাস বলল "আমার কিছুতেই তোমার সঙ্গে আসা উচিত হয় নি। কী সব কান্ড করে বেড়াচ্ছ। সবার কি আর তোমার মত সাহস আছে মিয়াঁ?"
সায়ক বলল "গাড়ি চলেছে তো। আর চিন্তা করছ কেন?"
আব্বাস বলল "চিন্তা করব না? চিন্তা না করার মত কী দেখলে তুমি? আমার এখনও বিয়ে হয় নি। যদি বিয়ে হবার আগেই মরে যাই তাহলে কী হবে?"
সায়ক চোখ মিটিমিটি করে বলল "বিয়েটা বড় কথা না অন্য কিছু? অন্য কিছু হলে বল, এখনই তানবীরকে বলছি জন্নতে নিয়ে যেতে"।
আব্বাস দুকান ধরল "তওবা তওবা, মিয়াঁ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার আব্বু জানতে পারলে আমাকে লাথ মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে"।
সায়ক বলল "সব কাজ আব্বুকে বলে কর নাকি?"
আব্বাস বলল "না না, তা কেন করব কিন্তু এসব কাজ করা যায় নাকি? ছি ছি ছি। কী যে বল"।
একটু দূরেই কানিংহাম ক্লক টাওয়ারের কাছে একটা বড় জটলা হয়েছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল ফের।
আব্বাস ভয়ার্ত গলায় বলল "ওই দেখো মিয়াঁ, আবার মনে হচ্ছে কোন ঝামেলা লেগেছে"।
সায়ক গাড়ি থেকে নামল।
আব্বাস অবাক হয়ে বলল "আবার কী হল?"
সায়ক বলল "নেমে যাও"।
আব্বাস ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বলল "মানে? নেমে যাব মানে? মাথা গেছে নাকি? এই ঝামেলার জায়গায় নেমে যাব?"

সায়ক কড়া গলায় বলল "যা বলছি শোন। এই জায়গা থেকে তানবীর ঠিক বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কখন, সেটা উপরওয়ালাই জানেন। আমাদের অন্য রুট ধরতে হবে"।

আব্বাস বলল "কোন রুট?"

সায়ক ধমক দিয়ে বলল "সেটা আমার সঙ্গে না গেলে কী করে বলব? চল শিগগিরি"।

আব্বাস তড়িঘড়ি নামল গাড়ি থেকে। সায়ক তানবীরকে বিদায় দিয়ে খিজি বাজারের একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করল।

আব্বাস বলল "এ আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

সায়ক বলল "পা চালাও"।

গলির দুপাশে একটার পর একটা দোকান। প্রত্যেকটা পাঠানদের চেঁচামেচি লেগেই রয়েছে। এই অঞ্চলে ঝামেলা রোজকার ঘটনা। তাতে আর বাজারে বিশেষ প্রভাব পড়ে না।

সায়ক কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে লাগল জোর পায়ে। পেছনে আব্বাস। অনেকটা রাস্তা পার হবার পরে একটা দোতলা পুরনো বাড়ির সামনে দাঁড়াল সায়ক।

আব্বাস হাঁফাচ্ছিল। তার মধ্যেই অবাক গলায় বলল "এ আবার কোথায় নিয়ে এলে?"

সায়ক উত্তর দিল না। বাড়িটার নিচে দোকান। মাঝখানে একটা সরু গলি। গলির ভেতর দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে একটা স্যাঁতস্যাঁতে সিঁড়ি।

সায়ক সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল।

আব্বাস গজগজ করতে করতে সায়কের পিছনে দৌড়তে লাগল।

দোতলায় উঠে দেখা গেল তিনটে দরজা।

সায়ক গালে হাত দিয়ে তিনটে দরজা মন দিয়ে দেখল। তারপর কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করল।

আব্বাস বলল "কী হল? কোথায় যেতে হবে ভুলে গেছ?"

সায়ক তীক্ষ্ণ চোখে তিনটে দরজার দিকে তাকাল। তারপর এক একটা দরজার দিকে আঙুল তুলে বিড়বিড় করতে লাগল "এক দো তিন, চার পাঁচ ছে...ইয়েস মনে পড়েছে"।

সিঁড়ি থেকে উঠে ডান দিকের দরজাটা তিনবার নক করল সায়ক।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

একজন লম্বা পাঠান জিজ্ঞাসু চোখে সায়কের দিকে তাকাল।
সায়ক বলল "আসলাম, লেখলো, মিট গরি দুরিয়া"।
পাঠান অবাক গলায় বলল "ক্যা?"
সায়ক হাত তুলল "সরি। গলতি হো গয়া"।
পাঠান একটা গালাগালি দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।
আব্বাস বলল "একী? তোমারও ভুল হল মিয়াঁ?"
সায়ক আব্বাসের দিকে তাকাল "এটাকে বলে ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড। নিশ্চয়ই এর পাশেরটা হবে"।
আব্বাস মাথায় হাত দিল "ইয়া আল্লাহ, আজ মারওয়াওগে তুম"।
সায়ক মাঝের দরজাটা তিনবার নক করল।
এক বোরখা পরিহিতা মহিলা দরজা খুললেন।
সায়ক বলল "আসলাম, লেখল, মিট গরি দুরিয়া..."।
মহিলা দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।
সায়ক আব্বাসের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল "চলে এসো। এবারে আর ভুল হয় নি"।

৫৪।
ঘরের ভিতরে দুজন পাঠান সোফায় বসে আছে। বোরখা পরিহিত মহিলা অন্য ঘরের ভিতর চলে গেলেন।
আব্বাস ভয়ে ভয়ে সায়কের দিকে তাকাল।
সায়ক আব্বাসকে পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল "আই হ্যাভ এ লিড। আলেক্সের সঙ্গে কথা বলব"।
দুজন পাঠান মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বলল "হু আর ইউ"?
সায়ক বলল "দ্যাটস নট ইম্পরট্যান্ট। প্লিজ টেল আলেক্স, ইন্ডিয়ান কবুতর হ্যাজ কাম"।
একজন তাদের বলল "সিট ডাউন"।
সায়ক সোফায় বসল।
আব্বাস ঘাবড়ে ছিল। সায়ক বলল "বস"।
আব্বাস সায়কের পাশে বসে বলল "একী মিয়া? কোথায় নিয়ে এলে?"
সায়ক বলল "চুপ করে বসে থাকো বললাম তো"।
একজন পাঠান উঠে ভেতরের ঘরে গেল।

কিছুক্ষণ পর একজন ছোট খাট চেহারার ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান এ ঘরে এসে সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল "প্লিজ কাম"।
সায়ক আকাসকে বলল "তুমি এখানেই বস, আমি আসছি"।
আকাস মুখ চুন করে বসে থাকল।
কিছুক্ষণ পর সায়ক ঘর থেকে বেরিয়ে বলল "চল"।
আকাসের যেন ধড়ে প্রাণ এল। সে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল "কোথায় যাবে?"
সায়ক বলল "তোমার কোথায় যেতে ইচ্ছা করছে?"
আকাস বলল "সে তো মাম্মিকে পাস। নিয়ে যেতে পারবে?"
সায়ক হেসে বলল "কেন নিয়ে যেতে পারব না? তুমি যাবে?"
আকাস গম্ভীর মুখে বলল "এইসব ইয়ার্কি আমার একদম ভাল লাগে না মিয়া। দেখতেই পারছ, এমনিতেই কী অবস্থা হয়ে আছে, তার মধ্যে তুমি এসব বলে যাচ্ছ"।
তারা আবার বাজারের মধ্যে ঢুকল। সায়ক বাজারের মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে একটা পিসিও থেকে ফারুককে ফোন করল।
ফারুক ধরলেন, "হ্যালো"।
"চাচা, কী অবস্থা?"
"তোমার কাজ হয়ে গেছে?"
"হ্যাঁ চাচা"।
"তুমি আর এদিকে এসো না এখন। গোটা বাজার আর্মি ঘিরে ফেলেছে"।
"সেকী? তাহলে কমিউনিকেটিং ডিভাইস, কম্পিউটার, এসবের কী হল?"
"সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সব সরিয়ে ফেলেছি"।
"থ্যাঙ্ক গড চাচা"।
"শোন, এখন কোথায় আছ?"
"ক্লক টাওয়ারের কাছে"।
"আচ্ছা, ওখান থেকেও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে স্টেশন পৌঁছে যাও। পেশোয়ার এখন আর তোমাদের জন্য নিরাপদ নয়। যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে। খুদা হাফেজ"।
"নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবে চাচা। খুদা হাফেজ"।
ফোনটা রেখে সায়ক পিসিও থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।
কিছুক্ষণ পরে একটা ফ্ল্যাটের সামনে এসে উপস্থিত হল তারা।

সায়ক ক্যামেরার ব্যাগটা ভ্যাটের মধ্যে ফেলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।
আব্বাস তার পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে বলল "ও মিয়াঁ, এত দামী জিনিস। সব ফেলে দিলে? প্রমাণ থাকল না তো কিছু?"
সায়ক বলল "কী আর করা? আর্মি এগুলো পেলে তো আমাদের ছাল ছাড়িয়ে নেবে"।
আব্বাস ব্যাজার মুখে হাঁটতে থাকল।
গলির বাইরে এসে অটো নিল সায়ক। রাস্তার দখল আর্মি নিয়ে নিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে বিক্ষোভকারীদের মেরে হটিয়ে দিয়েছে তারা।
দোকানগুলো আবার খুলে গেছে। লোকজন আবার রাস্তায় নেমেছে।
সায়ক হেসে বলল "এদের কাছে এসব জলভাত। এই কেউ মরছে, পরক্ষণেই আবার ব্যাক টু লাইফ"।
আব্বাস কিছু বলল না। সায়কের কাজকর্ম সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। গম্ভীর হয়ে বসে থাকল।
কিছুক্ষণ পর উশখুশ করে বলল "কাবাব মিস করব"।
 সায়ক বলল "আমিও"।
দু প্রান্তে ঘিঞ্জি বাজারের মধ্যে মানুষের কোলাহল। আজকে বিস্ফোরণ, কালকে খুন খারাপি, এই মানুষেরা এভাবেই বেঁচে থাকেন। সায়ক অস্ফুটে বলল "ভালো থেকো পেশোয়ার। ভালো থেকো মানবসভ্যতা"।
কিছুক্ষণের মধ্যে তারা স্টেশনে পৌঁছল।
দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল একটা ট্রেন ইসলামাবাদ যাচ্ছে, আরেকটা লাহোর।
আব্বাস বলল "কোথায় যাবে মিয়াঁ?"
সায়ক হাসল "অনেকদিন দেশে যাওয়া হয় না আব্বাস। যাবে নাকি?"
আব্বাস প্রথমে খুশি হল, পরক্ষণেই সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইয়ার্কি করছ না তো মিয়াঁ?"
সায়ক বলল "একেবারেই না। চল ক'দিন ছুটি কাটিয়ে আসা যাক। যাও লাহোরের দুটো টিকিট কেটে আনো"।
আব্বাস লাফাতে লাফাতে টিকিট কাটতে ছুটল।

৫৫।

পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে একটু দূরে বি এস এফের এক চেক পোস্টে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন তুষার। তার সঙ্গে পীযূষ এসেছেন।
তুষার বললেন "এত দেরী হচ্ছে কেন ওদের?"
পীযূষ বসে ছিলেন। বললেন "স্যার এমন কিছু দেরী তো হয় নি। আধ ঘন্টাও তো হয় নি"।
তুষার বললেন "আধঘন্টা অনেক সময়। তিরিশ মিনিট তোমার কম মনে হচ্ছে?"
পীযূষ একটু ইতস্তত করে বললেন "মিনিস্ট্রিকে কি কিছুই জানান নি স্যার?"
তুষার মাথা নাড়লেন "সম্ভব নয়। কিছুতেই মানবে না। মিজানুল হকই ভরসা এখন পীযূষ"।
পীযূষ বললেন "আমার আপনার দুজনেরই মনে হয় চাকরি চলে যাবে স্যার"।
তুষার বললেন "হু। যদি জানে"।
পীযূষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "চাকরি গেলে কেউ চাকরি দেবে না স্যার। আপনি দেবেন তো?"
তুষার হাসলেন "হ্যাঁ, আমি একটা কোম্পানি খুলব। নাম হবে ইনভেস্ট এন্ড আর্ন। তোমার যা টাকা পয়সা আছে ইনভেস্ট করে দিও, লাভ হলে নিয়ে যেও। লস হলে গেল"।
পীযূষ হো হো করে হেসে উঠলেন।
পীযূষ বললেন "স্যার, একটা খটকা এখনও থেকে গেল। হাসান মাকসুদ তো জানত, ও যাকে ফোন করবে তার ফোন ট্রেস করা যাবে। তাহলে এই বোকামিটা করতে গেল কেন?"
তুষার বললেন "কখনও কখনও জিনিয়াসরা সব কিছু পারফেক্ট করতে গিয়ে এক একটা এমন ভুলই করে ফেলে পীযূষ। হাসান এতটাই ওভার কনফিডেন্ট ছিল যে বাংলাদেশে আমরা কোন নেটওয়ার্ক ইউজ করতে পারব না, যে এই ভুলটা করে ফেলল। অবশ্য আরেকটা কারণও থাকতে পারে"।
পীযূষ জিজ্ঞাসু চোখে তুষারের দিকে তাকালেন।
তুষার বললেন "ভাইঝির প্রতি ওর সাবকনশাস মাইন্ডে এখনও ভালোবাসা ছিল। হয়ত নিজের কৃতকর্মের একটা ব্যাক আপ রাখতে চেয়েছিল লোকটা"।
বনগাঁর বি এস এফ চিফ বলবিন্দর সিং এসে ঢুকলেন অফিসে। বললেন "স্যার কোন খবর?"

তুষার বললেন "খবর তো তুমি দেবে বলবিন্দর। মিজানুল তোমার বন্ধু। তুমিই ভাল বলতে পারবে"।
বলবিন্দর পীযূষকে দেখালেন "মিজানুল হককে পীযূষও ভাল করে চেনেন। এক কথার মানুষ। চিন্তা করবেন না স্যার"।
তুষার বললেন "চিন্তা কি আর সাধে করছি সিং, এত বড় একটা অপারেশন হচ্ছে যেখানে আমরা ছাড়া দেশের গভর্নমেন্টের কাছে কোন খবরই নেই। যদি কিছু এদিক ওদিক হয় তো সব গেল"।
বলবিন্দর বললেন "স্যার,আমাদের দেশের মেয়েই বিপদে আছে। আমরা তাকে হেল্প করছি। কোন পাপ তো করছি না। ওপরওয়ালার ওপর ভরসা রাখুন স্যার, নিশ্চয়ই উনি আমাদের সাহায্য করবেন"।
তুষার হাসলেন "আমি কোন ওপরওয়ালাকে বিশ্বাস করি না সিং। এই মুহূর্তে মিজানুল হকই আমার সব কিছু। আমাদের এন এস জি কমান্ডাররা পর্যন্ত আমার ভরসাতেই বর্ডার পার করেছে"...
তুষারের কথা শেষ হল না বলবিন্দরের ফোন বেজে উঠল। বলবিন্দর ফোনটা ধরলেন, একটু কথা বলেই হাসলেন "বলেছিলাম না স্যার, উপরওয়ালা আমাদের নিশ্চয়ই সাপোর্ট করবেন। অপারেশন ইজ সাক্সেসফুল। বাইরে চলুন স্যার"।
তুষার দৌড়ে বেরোলেন অফিস থেকে। তার পেছন পেছন সবাই। ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে নো ম্যান্স ল্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালেন। বি ডি আরের যারা ওপারে চেক পোস্টে ছিলেন, বলবিন্দরকে দেখে বললেন "স্যার, প্লিজ আসুন, মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের দেশের বদনাম"।
বলবিন্দর তুষারকে বললেন "স্যার, চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে আছি জানলে মিজানুল রাগ করবে"।
সবাই মিলে বাংলাদেশে ঢুকলেন। বিডি আরের একজন রক্ষী তাদের জন্য চেয়ার এনে দিলেন। তিনজন বসলেন। তুষার উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন "কোথায় ওরা বলবিন্দর?"
বলবিন্দর বললেন "স্যার প্লিজ অধৈর্য হবেন না। একটু তো অপেক্ষা করুন"।
তুষার দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন।
খানিকক্ষণ পরেই একটা আর্মি ভ্যান আসতে দেখা গেল।
তুষার লাফিয়ে উঠলেন। গাড়িটা এসে দাঁড়ালে মিজানুল নামলেন। তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "উই ডিড ইট"।
তুষার মিজানুলকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন "মেয়েটা কোথায়?"

মিজানুল বললেন "অ্যাম্বুলেন্স আছে তো?"
তুষার বললেন "হ্যাঁ"।
মিজানুল বললেন "গাড়ি নিয়ে আসুন এখানে"।
তুষার বলবিন্দরের দিকে তাকালেন। বলবিন্দর অ্যাম্বুলেন্স আনতে ছুটলেন।
মিজানুল তার অফিসারদের নির্দেশ দিলেন।
কিছুক্ষণ পরে মিনিকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিল।
মিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। কোন মতে কাপড়ে জড়িয়ে মিজানুল তাকে নিয়ে এসেছেন।
তুষার মিনির অবস্থা দেখে মিজানুলকে বললেন "কারা করেছে?"
মিজানুল বললেন "গাড়ির ভেতর বসে আছে। চলুন দেখবেন"।
তুষার গাড়ির ভেতর ঢুকলেন। দেখলেন নাজিব এবং মনোয়ারা বসে আছে।
তুষার বললেন "আপনারা মানুষ?"
নাজিবের চোখ মুখ থেকে রক্ত বেরচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সে কড়া চোখে তুষারের দিকে তকিয়ে মিজানুলকে বলল "আপনার সাহস কী করে হয় অফিসার? ইন্ডিয়ান কুত্তাগুলোর কাছে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে?"
মিজানুল এগিয়ে গিয়ে এক ঘুষি মারলেন নাজিবের মুখে। তুষারকে বললেন "নিয়ে যান দুজনকেই। মহিলা বলে ছেড়ে দেবেন না। দুটোই সমান জানোয়ার। আরেকটা ছিল। সেটার লাশ ফেলে দিয়ে এসেছি। এরা আমাদের দেশের কলঙ্ক। বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেছিলেন আর এরা আবার সেটাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে শুরু করেছে। এদের বিচার আল্লাহ করবেন, আমি নিশ্চিত"।
তুষার মিজানুলকে বললেন "অনেক ধন্যবাদ বন্ধু। আমি আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, দেখা হবে আবার আপনার সঙ্গে"।
মিজানুল বললেন "ওসব বলবেন না। একজন মানুষ যা করত আমি তাই করেছি। আপনার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, এসব জানোয়াররা যেন শাস্তি পায়, প্লিজ এনশিওর করবেন। আরেকটা কথা, এদের কাছ থেকে আমি একটা কম্পিউটার, দুটো ট্যাব আর কিছু বই পেয়েছি। আপনাদের গাড়িতে তুলে দিচ্ছি সে সব কিছুই"।
তুষার হাসলেন "আমি টুপি খুললাম আপনার সামনে জনাব। ইউ আর গ্রেট"।
মিজানুল বললেন "আপনাকে তো আমি বললাম, একজন মানুষ হিসেবে যা মনে হয়েছে আমি তাই করেছি"।

তুষার বললেন "সমস্যা তো ওখানেই হক সাহেব, মানুষের সংখ্যাটাই আজকাল কমে যাচ্ছে। ভাল থাকবেন বন্ধু"।

মিজানুল বললেন "নিশ্চয়ই। খুদা হাফেজ"।

তুষার বলবিন্দরকে বললেন "এ দুজন মেহমানকে আমার অফিসে পৌঁছে দিতে হবে যে"।

বলবিন্দর মাথা নাড়লেন "সার্টেনলি স্যার"।

৫৬।

রেহান শ্রীনগরে ফিরলেন রাতের দিকে। এয়ারপোর্টে তারেক এবং আনোয়ার তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

রেহানকে দেখে দুজনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। রেহান গাড়িতে উঠে বলল "কী খবর?"

তারেক বলল "এই মুহূর্তে শান্তি আছে চারদিকে"।

রেহান বললেন "তার মানেই তো ঝড়ের আগের শান্তি। কোথাও বিক্ষোভ হয়েছে আজ?"

তারেক বলল "লালচকে হয়েছে"।

রেহান হতাশ গলায় বললেন "সে তো রোজের গল্প"।

এয়ারপোর্টের পরে অনেকটা এলাকা পেরিয়ে মূল শ্রীনগর শহরে ঢুকতে হয়। চারদিকে ভারতীয় সেনা টহল দিচ্ছে। এত রাতে বেশিরভাগ দোকানও বন্ধ।

রেহানের ফোন বাজছিল। রেহান ধরলেন। বললেন "হ্যালো"।

"স্যার, বিলাল বলছি"।

রেহান বললেন "বল"।

"স্যার ইসমাইল আব্বাসের কথা মনে আছে? হাইজ্যাকিঙের সময় যাকে ধরা হয়েছিল"?

"হ্যাঁ, সে তো এখন সেন্ট্রাল জেলে আছে"।

"স্যার, পাক্কা খবর আছে"।

"কী?"

"ইসমাইল আব্বাস সেলের ভেতর থেকেই অপারেট করছে। মোবাইল ফোন আছে ওর কাছে"।

"তুমি শিওর?"

"হান্ড্রেড পারসেন্ট স্যার। খুনা হাফিজ"।
রেহান কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে গেল।
রেহান একটু ভেবে আনোয়ারকে বললেন "সেন্ট্রাল জেল চল। জলদি"।
আনোয়ার অবাক হয়ে বলল "কিন্তু স্যার বাড়ি..."
রেহান ধমক দিলেন "যা বলছি চুপচাপ কর"।
আনোয়ার গাড়ির স্পিড বাড়াল।
#
সেন্ট্রাল জেলের গেটের বাইরে গাড়ি রেখে রেহান গেটে নক করলেন।
একজন সেপাই ছোট একটা দরজা খুলে বলল "কে?"
রেহান আই কার্ড বের করে বললেন "জেলার সাহেব কোথায়?"
সেপাই রেহানের আই কার্ড দেখেই দরজা খুলে দিল। বলল "অফিসেই আছেন স্যার"।
সেন্ট্রাল জেলের জেলার হিলাল আহমেদ অফিসে বসে কাজ করছিলেন।
রেহানকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। অবাক গলায় বললেন "স্যার, এত রাতে?"
রেহান বললেন "ইসমাইল আব্বাস কোন সেলে আছে মিস্টার আহমেদ?"
হিলাল আহমেদ বললেন "ওকে তো আলাদা সেলেই রাখা হয়েছে স্যার"।
রেহান বললেন "চাবিটা দিন। আমি ওর সেলে যেতে চাই"।
হিলাল বিস্মিত গলায় বললেন "এত রাতে?"
রেহান বললেন "কেন? কোন সমস্যা আছে?"
হিলাল বললেন "না না স্যার, আপনি বললে তো মানতেই হবে"।
রেহান বললেন "তবে চলুন"।
হিলাল চাবি নিলেন। দুজন কনস্টেবলকে বললেন তাদের সঙ্গে যেতে।
তারা জেলের ভিতর প্রবেশ করলেন। জেলের ভেতর অনেকটা হাঁটার পর স্পেশাল কয়েদিদের সেলে যেতে হয়। রেহান বুঝতে পারছিলেন প্রতিটা সেল থেকেই কৌতূহলী চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু রেহান সেসবের তোয়াক্কা করলেন না।
একটা ছোট সেলের সামনে গিয়ে হিলাল বললেন "এই যে স্যার। ইসমাইলের সেল"।
রেহান বললেন "দরজা খুলুন। আমাকে একটা টর্চ দিন"।
হিলাল একজন কনস্টেবলকে ইঙ্গিত করলেন। সে গিয়ে দরজা খুলে দিল।
ইসমাইল আব্বাস চেঁচিয়ে উঠল "কউন হে রে?"

রেহান বললেন "তোর বাপ"।

ইসমাইল বলল "জানোয়ারের বাচ্চা, তোর সাহস হয় কী করে আমার বাপ তুলে কথা বলিস?"

রেহান ইসমাইলকে সটান একটা লাথি মারল। ইসমাইল মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝের ওপর। টর্চ জ্বালিয়ে ছোট্ট ঘরটার বিভিন্ন কোণে আলো ফেললেন। কোথাও কিছু পেলেন না।

ইসমাইল খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল "ক্যা রে মাদারচোদ, কুছ নেহী মিলা ক্যা?"

রেহান ইসমাইলকে আবার লাথি মারলেন। হিলাল দৌড়ে এলেন "স্যার, জেলের মধ্যে এভাবে কয়েদীকে মারা বেআইনি"।

রেহান হিলালের দিকে তাকিয়ে বললেন "কোন কিছু বেআইনি না। এরা যখন আমাদের লোকেদের গুলি করে সেটা কোথাকার আইন বলে দেয়?"

হিলাল চুপ করে গেলেন।

রেহান টর্চ নিয়ে আবার ঘর সার্চ করতে শুরু করল। সেলের প্রতিটা কোণে আলো ফেলল। কিছুই পাওয়া গেল না।

ইসমাইল মেঝেতে শুয়েই হেসে যাচ্ছে।

রেহান সিমেন্টের মেঝেতে বসে পড়ল। মেঝেতে কান দিয়ে মেঝেতে ঘুষি মারতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে তার মুখে হাসি ফুটল। মেঝের একটা ইট সরাতেই একটা মোবাইল পাওয়া গেল।

রেহান মোবাইলটা নিয়ে ইসমাইলকে আরেকটা লাথি মেরে বললেন "তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে"।

ইসমাইল এবার আর হাসল না। চুপ করে থাকল।

রেহান হিলালের দিকে মোবাইলটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন "এই জিনিসটা এখানে এল কী করে?"

হিলাল বললেন "জানি না স্যার। এত বড় জেলের সব কিছু কি দেখা সম্ভব আপনিই বলুন?"

রেহান বললেন "কাল সকালে আমি আবার আসব। এসে যেন দেখতে পাই ওর সেল চেঞ্জ হয়ে গেছে। আই ওয়ান্ট সিসিটিভি সারভেইলেন্স ইন দ্যাট রুম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?"

হিলাল ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লেন।

রেহান ফোনটা নিলেন। বললেন "এটা আমি নিয়ে গেলাম। প্রয়োজনে ইসমাইলকে অন্য সেলে ট্রান্সফার করতে হবে"।

হিলাল বললেন "জি স্যার"।

রেহান বললেন "গুড নাইট"।

হিলাল বললেন "চলুন স্যার, আপনাকে গেট অবধি ছেড়ে দিয়ে আসি"।

রেহান রওনা দিতেই পেছন থেকে পরপর দুটো বুলেট তার মাথায় এসে লাগল। রেহান মাটিতে পড়ে গেলেন। পাশের সেলগুলো থেকে কয়েদীরা উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল।

ইসমাইল হো হো করে হেসে রেহানের স্থির শরীরে লাথি মেরে সোল্লাসে বলল "শুধু মোবাইল না রে ইন্ডিয়ানদের কুত্তা, সেলের ভিতর আরও অনেক কিছুই রেখেছি।"

হিলাল আহমেদের দিকে বন্দুক তাক করল ইসমাইল, "চল, ওর শেখকে বের কর এবার"।

৫৭।

ভোর বেলা।

নিয়াজি ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় এলেন।

বৃষ্টি পড়ছে।

নিয়াজি ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় একা একাই ভিজতে ভিজতে হাঁটতে বেরলেন। তার নিরাপত্তারক্ষীরা তার পেছন পেছন যাচ্ছিল নিয়াজি নিরস্ত করলেন তাদের। জওয়ানরা ওয়ার্ম আপ করছে। নিয়াজি তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। সবাই একটু ত্রস্ত হল। নিয়াজি সবাইকে স্বাভাবিক হতে বলে নিজেও ওয়ার্ম আপ করা শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই জওয়ানরা দৌড়তে শুরু করল।

নিয়াজিও তাদের সঙ্গে দৌড়তে লাগলেন বৃষ্টির মধ্যেই। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল ট্রেনিং এর প্রথম দিনগুলোর কথা। কী কঠিন ট্রেনিংই না হত তাদের। অনেকখানি পথ দৌড়ে বুঝলেন দমে কুলোচ্ছে না। দাঁড়িয়ে পড়ে জওয়ানদের বললেন "ক্যারি অন"।

জওয়ানরা দৌড়তে দৌড়তে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল।

নিয়াজি ভিজে গেছিলেন পুরোটাই। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। জগিং করতে করতে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলেন।

হীম শীতল ঠান্ডা জলে স্নান করলেন। দাড়ি কাটলেন।

তারপর আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে নিজের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। নিজের মনে মনে বললেন "ডর ডর কে নেহী জিনা। ডর ডর কে নেহী জিনা। নেহী জিনা"।

কিছুক্ষণ বাদে ইউনিফর্ম পরে কোয়ার্টারের দরজায় তালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের বললেন "গাড়ি বের কর। আমি প্রেসিডেন্ট হাউজ যাব"।

দু মিনিটের মধ্যে তার কনভয় এসে হাজির হল।

নিয়াজি গাড়িতে উঠলেন।

প্রেসিডেন্ট হাউজে পৌঁছে নিয়াজি দেখলেন প্রেসের লোকজন হাউজের বাইরেই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে।

তাকে দেখতে পেয়েই ফটো তোলা শুরু করল। নিয়াজি কড়া গলায় বললেন "এখানে তামাশা হচ্ছে?" সবাই ভয় পেয়ে ফটো তোলা বন্ধ করল।

প্রেসিডেন্ট হাউজে ঢুকে নিয়াজি নিরাপত্তারক্ষীর চিফকে বললেন "উমর খান এবং রশিদকে খবর দিন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তারা যেন প্রেসিডেন্ট হাউজে আসেন"।

নিয়াজি ড্রয়িংরুমে গেলেন। চুপ করে বসলেন। দেওয়ালে জিন্নাহর ফটো। সুদৃশ্য আসবাবপত্রে ড্রয়িংরুম সুন্দরভাবে সাজানো। বেশ কয়েকজন খানসামা পর্দার আড়ালে দাঁড়ানো। একবার ডাকলেই সব রকম খিদমৎ খাটতে দৌড়ে আসবে। তার ফোন বাজছিল।

নিয়াজি দেখলেন একটা আননোন নম্বর থেকে ফোন আসছে।

ধরলেন না।

ফোন আবার বাজতে শুরু করেছে।

অন্য সময় হলে গুলাম মহম্মদকে ফোন ধরে ধমক দিতে বলতেন।

এবারে ফোনটাই অফ করে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রেসিডেন্ট হাউজের সিকিউরিটি চিফ হাঁফাতে হাঁফাতে এলেন, "স্যার, প্লিজ নিউজ চ্যানেল দেখুন"।

নিয়াজি অবাক হয়ে বললেন "কেন?"

সিকিউরিটি চিফ রিমোটটা নিয়ে টিভি অন করলেন।

নিয়াজি বিরক্ত হয়ে বললেন "কী হয়েছে বলবে তো?"

সিকিউরিটি চিফ আল জাজিরা অ্যানেলে দিল। টিভিতে দেখাচ্ছে পেশোয়ারের বর্ডারের কাছে একটা বাড়িতে আমেরিকা বোমা বিস্ফোরণ করে গোটা বাড়িটাই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আমেরিকা দাবী করেছে বাড়ির মধ্যে ইসলামিক স্টেটের অন্যতম মস্তিষ্ক কাশেম সোলেমানি ছিল। পাকিস্তান সরকার এখনও এই মুহূর্তে এই অপারেশন সম্পর্কে কিছুই জানে না।
নিয়াজি হতভম্ব গলায় বললেন "আমার দেশের নিউজ আমাকেই টিভি দেখে জানতে হচ্ছে?"
সিকিউরিটি চিফ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।
৫৮।
সকাল সাতটা।
জ্যোতির্ময় বসে ছিলেন একা।
তুষার নাজিবকে নিয়ে ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করলেন।
জ্যোতির্ময় চমকে তুষারের দিকে তাকালেন।
তুষার বললেন "আপনি একা একা ছিলেন, আপনার একজন সঙ্গী এনে দিলাম"।
একজন কমান্ডো এসে জ্যোতির্ময়ের পাশে নাজিবকে বসাল।
তুষার চেয়ারে বসে বললেন "মিস্টার মাকসুদ। আপনার ভাইঝিকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। আপাতত মেয়েটা মারাত্মক মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল শকে আছে। এই ভদ্রলোক আপনার ভাইঝির ওপরে এমন টর্চার করেছিল যা স্বয়ং শয়তানকে করতে হলেও উনি হয়ত দুবার ভাবতেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে, চুল কেটে, পাশবিক অত্যাচার করে, মেয়েটার গায়ে গুড় মাখিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে পিঁপড়েরা এসে ওকে খুবলে খুবলে খেতে পারে। আপনি বলেছিলেন মিনির জন্য আপনিই এই ছেলেকে পছন্দ করেছিলেন। ছেলে নাকি ধর্ম শিক্ষায় ভাল, নীতিশিক্ষায় ভাল, বনেদী পরিবার। তা এই তার উদাহরণ?"
জ্যোতির্ময় উত্তর দিলেন না। চোখ বন্ধ করলেন।
তুষার বললেন "পৃথিবীর কোন ধর্ম, কোন নীতি, কোন পরিবার মেয়েদের প্রতি এইরকম ব্যবহার করার কথা বলে না। যারা এই সব কিছুর দোহাই দিয়ে এগুলো করে, তারা মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। আই অ্যাম সরি টু সে মিস্টার মাকসুদ, যে পথ আপনি বেছেছেন, তা শুধু আপনার জন্য না, মানবতার জন্যও ক্ষতিকারক। কী চান আপনি? গোটা পৃথিবীতে কেবল কয়েকজন হিংস্র মানুষের মত দেখতে পশু বেঁচে থাকবে? আর সুস্থ পৃথিবীর মানুষ সেটা হতে দেবে? যদি ভেবে থাকেন, তবে আপনি ভুল ভাবছেন"।

জ্যোতির্ময় চোখ খুললেন না।

তুষার বললেন "আমি উঠলাম। আপনারা মিটিং করুন। আপনারা দুজনেই হয়ত জন্নতে যাবার জন্য এ সব কিছু করেছেন, তবে আমি আপনাদের দুজনকেই একটা কথা দিতে পারি, জীবিত অবস্থাতেই জাহান্নাম কী, তা আপনাদের দেখিয়ে দেব। ইয়ে ওয়াদা হে মেরা।"

তুষার ঘর থেকে বেরোলেন। রেহানের খবরটা রাস্তাতেই পেয়েছেন। মাথা কাজ করছিল না তার।

আশরফ খান চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। পেটে ব্যান্ডেজ করা। চোখে মুখে যন্ত্রণার ছবি স্পষ্ট। টিভি চলছে।

বীরেন বসে ছিল চুপচাপ। তুষারকে ঢুকতে দেখে বীরেন উঠে দাঁড়াল। তুষার বললেন "বীরেন, তুমি আশরফকে নিয়ে কলকাতার গেস্ট হাউজে গিয়ে বিশ্রাম কর। কাল থেকে তোমার হসপিটালে ডিউটি থাকবে। মেয়েটা যতক্ষণ না জ্ঞান ফেরে ততক্ষণ ওই রুমের নজরদারি তোমার দায়িত্বে"।

আশরফ বললেন "আমি বেটার আছি স্যার। আপাতত এখানেই থাকি। বীরেন তুমি যাও"।

বীরেন জিজ্ঞাসু চোখে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "ঠিক আছে বীরেন, আশরফ থাকুক। মেডিকেল সাপোর্ট টিম তো আছেই, সেরকম সমস্যা হলে ওকে আমি নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে পারব"।

বীরেন ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল।

তুষার বসলেন।

টিভিতে পেশোয়ারের নিউজটা দেখাচ্ছে।

আশরফ বললেন "সব ভালো খবর রেহানের খবরটায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে স্যার"।

তুষার চোখ বন্ধ করলেন। রেহানের মুখটা ভেসে উঠছে মুখের সামনে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "আমাদের ট্রেনিং টাইমে একটা কথা বলতেন আমাদের ট্রেনিং অফিসার। যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পিছনে ফিরে দেখবে না। তোমার বন্ধু, প্রাণের মানুষ, সবাই ধীরে ধীরে পড়ে যাবে, তোমাকে কর্তব্যে অবিচল থাকতে হবে। নইলে অভীষ্ট লক্ষ্যে কোন দিন পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু কখনও কখনও এত আবেগহীন থাকা যায় না। মানুষ তো আফটার অল। সায়কের কী খবর?"

আশরফ বললেন "ফারুক যোগাযোগ করেছিলেন, সায়ক কালকেই পেশোয়ার ছেড়েছে। কোথায় গেছে জানা নেই"।

তুষার গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

আশরফ ক্লান্ত ছিলেন। চোখ বন্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ পর তুষারের মোবাইল বেজে উঠল।

তুষার দেখলেন একটা আননোন নম্বর থেকে মেসেজ এসেছে। তাতে শুধু লেখা "মা তুকে সালাম। ইনকিলাব জিন্দাবাদ"।

তুষারের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।

আশরফ বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

তুষার আশরফকে বিরক্ত করলেন না।

উঠে জানলার কাছে গেলেন।

আরেকটা দিন...

আরও লড়াই...

তুষার ফিসফিস করে বললেন "লং লিভ রেভেলিউশন এগেইন্সট এনিমিজ অফ হিউম্যানিটি"...

(সব চরিত্র, স্থান, কাল, পাত্র কাল্পনিক। কোন ধর্ম বা রাজনৈতিক দলকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে এই লেখাটি লেখা হয় নি)